সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নাদবী (রহ.)

আকাবিরে দেওবন্দ
ইতিহাস ও ঐতিহ্য

অনুবাদ
সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নাদবী (রহ.)-এর
খাদেম ও খলিফা
মাওলানা জুলফিকার আলী নাদবী (ফাজেলে দেওবন্দ)
শিক্ষক, মাদরাসাতুল হুদা, বাসাবো, ঢাকা
কর্তৃক অনুদিত

(14) اکابر دیوبند از سید ابوالحسن علی ندویؒ

مترجم: مولانا ذوالفقار ندوی

ناشر: محمد برادرس 38، بنگلہ بازار، ڈھاکہ 1100.

মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আকাবিরে দেওবন্দ ঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য
মুল : সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নাদভী (রহ.)
অনুবাদ : জুলফিকার আলী নাদবী (ফাজেলে দেওবন্দ)

প্রকাশক
মুহাম্মদ আবদুর রউফ
মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : 01822-806163, 01776-438110

স্বত্ব : প্রকাশক

প্রকাশকাল
এপ্রিল, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
বৈশাখ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
রজব, ১৪৩৭ ঈসায়ী

অক্ষর সংযোজন
মাহফুজ কম্পিউটার

মুদ্রণ
মেসার্স তাওয়াক্কাল প্রেস
৬৬/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য : ১৩০.০০ (একশত ত্রিশ) টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-91841-5-7

AKABIRE DEOBAND : Etihas O Oitijhya (History & Tradition of Akabire Deoband) : Written by Sayeed Abul Hasan Ali Nadvi (Rh.), Translated by Julfiqar Ali Nadvi, Published by Muhammad Abdur Rouf, Muhammad Brothers, 38, Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Printed by M/S Tawakkal Press, 66/1, Naya Paltan, Dhaka-1000. Cell : 01822-806163; Price : Tk. 130.00- Only. U$: 5.00 Only.

সূচিপত্র

অভিমত ৬

অনুবাদকের আরজ ৮

ভূমিকা ১০

আক্বীদাগত ও আমলী ত্রুটি ১৩

অমুসলিমদের সাথে মেলামেশা এবং কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার ঘাটতির কারণে মুসলমানদের কিছু আক্বীদাগত ও আমলী ত্রুটি ১৩

মুজাদ্দিদে আলফে সানী ইমাম আহমদ ইবন আব্দুল আহাদ সেরহিন্দী (৯৭১-১০৩৪ হি.) ১৫

হাকিমুল ইসলাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.) ১৮

এ সকল হিকমতপূর্ণ প্রচেষ্টার ফলাফল ২০

সাইয়িদ আহমদ শহীদ রহ. (১২০১-১২৪৬ হি) ২২

শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) (শা. ১২৪৬ হি) ২৪

কুরআন-সুন্নাহ-এর শিক্ষা প্রদান ও হাদীসের উপর আমল করার ক্ষেত্রে প্রধান দু'টি দল ২৭; দ্বীনি দাওয়াত, তরবিয়ত, শিক্ষা ও প্রচার-প্রসারের কয়েকটি গুরুত্ব পূর্ণ প্রতিষ্ঠান ২৮; দারুল উলূম দেওবন্দ ও মাজাহেরুল উলূম সাহারনপুর এ দ্বয়ের দ্বীনী অবদান ২৯;

মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী (রহ.) ৩১

মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) ৩২

হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) ৩৩

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সংগ্রামের মহান নায়ক শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (রহ.) ৩৪

সাইয়িদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) ৩৬

মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) ৩৯

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলভী (রহ.) ৪২

বিদ'আতী দল ও কাফির ফতওয়া প্রদানকারীদের মুল নিশানা ৪২; দেওবন্দী মাদরাসাসমূহের সফলতার রহস্য ৪৩;

নাদওয়াতুল উলামা ৪৪

নদওয়াতুল উলামার দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্ম পদ্ধতি ৪৫

আল্লামা সাইয়িদ সুলায়মান নাদভী (রহ.) ৪৭

আরব বিশ্বে সৃষ্ট বিপ্লব ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে নদওয়াতুল উলামার দৃষ্টিভঙ্গি ৪৮; তাবলীগী জামাত ও তার কর্মতৎপরতা ৪৯; অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতি ৫৪;

মাদরাসার ছাত্রদের মর্যাদা ও দায়িত্ব-কর্তব্য ৫৬

মাদরাসার পরিচয় ৫৬; মাদরাসার সুমহান যিম্মাদারী ৫৭; মাদরাসার ছাত্র ও ফারেগীন আলিমগণের যিম্মাদারী ৫৮; মাদরাসার ছাত্র ও ফারেগীন আলিমগণের বৈশিষ্ট্য ৬০; আধ্যাত্মিক গুণাবলী ৬১; দ্বীনী মাদরাসাসমূহে আধ্যাত্মিক গুণাবলীর অবক্ষয় ৬২; কয়েকজন বিপ্লবী মানুষ ৬৩; মাদরাসাসমূহের স্থবিরতা ৬৪; বিশ্ব নেতা আজ অনুসারী হয়ে আছে ৬৫; হীনম্মন্যতা কেন? ৬৫; আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদাবোধ ৬৬; এ পথ ভোগ-বিলাসের নয় ৭০; যুগের অসহায়ত্ব ও তার চরম পিপাসা ৭১; নবূয়তী ইলমই হলো প্রকৃত জীবন পাথেয় ৭২; জীবনের সাথে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পর্ক এবং এ জন্য আমাদের পূর্বপুরুষগণের প্রচেষ্টা ৭৩; যুগের দাবি ৭৮; পাঠ্য তালিকায় সংযোজন-বিয়োজন ৭৯; ধর্মীয় নেতৃত্বদানের জন্য বহুমুখী যোগ্যতার প্রয়োজন ৭৯; নতুন মতাদর্শ সম্পর্কে গভীর ও বিশ্লেষণধর্মী জ্ঞানের প্রয়োজন ৮০; নতুন অধ্যয়নের সংকট ও দায়িত্ব ৮০; মাতৃভাষা ও সাহিত্যের সাথে সম্পর্ক ৮১; আরবী ভাষায় দক্ষতা ৮৪; সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাসের হিফাজত ৮৫; আধুনিক যুগের ফিতনা ৮৭; আধুনিক যুগের দায়িত্ব ৮৮;

আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও তার প্রতিরোধ ৮৯

দীর্ঘ দিনের মুহব্বতপূর্ণ সুসম্পর্ক ৮৯; দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার আসল কারণ ছিল দ্বীনী আত্মমর্যাদাবোধ ৯০; পাশ্চাত্য সভ্যতার ও শিক্ষার ফিতনার মুকাবিলা ৯১; সঠিক কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ ৯১; মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী সাহেব (রহ.)-এর আসল বিশেষত্ব ৯৩; অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক ও চিরন্তন প্রতিশ্রুতি ৯৫; নতুন যুগ, নতুন ফিতনা ৯৬; আধুনিক যুগের ভয়ংকর ফিতনা ৯৭; বিদ'আত মুকাবিলাকারীদের উত্তরসূরী ও তাদের যিম্মাদারী ৯৯; বর্তমান যুগের ইনকিলাব বিদ্যুৎ গতিসম্পন্ন ও বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত ১০১; গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রের ব্যাপক বিস্তৃত পরিধি ১০১; অভ্যন্তরীন বিপদ ১০২; স্বকীয়তা ও স্বচ্ছতা ইসলামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ১০২; সকল ধর্মই এক নয়, বরং হক একটি ১০৩; অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন দু'জন মহাপুরুষ ১০৩; ইসলাহ ও তাজদীদের ইতিহাসে ব্যক্তির মর্যাদা ও কাজ ১০৪; মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) ও শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রহ.)-এর অবদান ১০৫; দারুল উলূম দেওবন্দের ছাত্রদের যিম্মাদারী ১০৬; অত্যন্ত নাজুক মুহূর্ত ১০৬; যুগের আবুল ফয়েজ ও ফয়জী ১০৭; ধর্মহীনতা ও সংশয়ের নতুন দরজা ১০৭; বাস্তবসম্মত পর্যালোচনা ও ব্যাপক প্রস্তুতি ১০৮; ধর্মের পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি ও তার ফিতনা ১০৮; দেওবন্দের আলিমগণ অত্যন্ত সফল ও প্রভাব সৃষ্টিকারী হতে পারেন ১০৯; মানসিক প্রস্তুতি ও ব্যক্তিত্ব গঠন ১০৯; বিবেকের সওদাবাজীর যুগ ১১০; নতুন নেতৃত্বের প্রয়োজন ১১০; বাস্তবতাবোধ ও আত্ম পরিচয় ১১১;

প্রকাশকের কথা

মুসলিম বিশ্বের অন্যতম বরেণ্য ইসলামী স্কলার আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) লিখিত 'আকাবীরে দেওবন্দ : ইতিহাস ও ঐতিহ্য' একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসনির্ভর গ্রন্থ। এতে বিজ্ঞ গ্রন্থকার ভারতীয় উপমহাদেশের বিদগ্ধ আলিম, মুহাদ্দিস, আধ্যাত্মিক সাধক, মুবাল্লিগ, শিক্ষাবিদ বিশেষত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.), সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রহ.), শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.), আল্লামা কাসেম নানুতুবী (রহ.), আল্লামা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) ও শায়খুল হিন্দ আল্লামা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহ.), সাইয়িদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.), আল্লামা খলিল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.), শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া কান্ধলভী (রহ.), আল্লামা সাইয়িদ সুলায়মান নদভী (রহ.) এর মত প্রাতঃস্মরণীয় ও মহিমান্বিত ব্যক্তিত্বের জীবনধারা এবং ভারতবর্ষে তাঁদের বহুমাত্রিক খিদমত ও অবদান সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

অধিকন্তু দারুল উলুম দেওবন্দ, মাযাহিরুল উলুম সাহারানপুর, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা, তাবলিগী জামায়াত সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ পর্যালোচনা রয়েছে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে। ভারতীয় উপমহাদেশে দ্বীনি শিক্ষার বিস্তার, আমল-আকীদার সংশোধন, শির্ক-বিদআত দূরীকরণ, তাওহীদ ও সুন্নাতের প্রতিষ্ঠায় উপর্যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। গ্রন্থে বর্ণিত ও পর্যালোচিত বিষয়াবলি সাধারণ পাঠক ও সিরিয়াস গবেষকদের জন্য তথ্য-উপাত্তের উৎস ও উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে– এটা আমার প্রত্যাশা ও প্রতীতি।

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' ইতোমধ্যে বিশ্বখ্যাত ইসলামী গবেষক ও জননন্দিত বুদ্ধিজীবী আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নাদভী (রহ.) এর প্রায় সব গ্রন্থ বাংলায় ভাষান্তর করে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। 'আকাবীরে দেওবন্দ : ইতিহাস ও ঐতিহ্য' গ্রন্থটি তারই ধারাবাহিতার অংশ হিসেবে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি আল্লাহ তা'আলার দরবারে বিনয়সহকারে শোকরিয়া আদায় করি। গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদভী (রহ.) এর অন্যতম খাদেম ও খলিফা, ঢাকার বাসাবোস্থ মাদরাসাতুল হুদার শিক্ষক মাওলানা জুলফিকার আলী নাদভী। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ মেহনত কবুল করুন। আমীন।

মুহাম্মদ আবদুর রউফ

অভিমত

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) কেন্দ্রীক দেওবন্দী চিন্তাধারার ধারক-বাহক উলামা-মাশায়েখদের কর্ম সাধনা, জীবনধারা, সংস্কার আন্দোলন ও ভূমিকা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে উজ্জ্বল মাইলফলক হয়ে রয়েছে। সাইয়িদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.)-এর তরিকায়ে মুহাম্মদী আন্দোলন, আল্লামা কাছেম নানুতুবী (রহ.)-এর দ্বীনি শিক্ষা বিস্তার, হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর চরিত্র সংশোধন প্রয়াস, আল্লামা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর ইংরেজ বিরোধী সংগ্রাম, মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী (রহ.) এর খ্রিস্টান মিশনারিদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে আপোষহীন ভূমিকা, সাইয়্যিদ সুলায়মান নাদভীর সীরাত সাহিত্য প্রণয়ন, আল্লামা খলিল আহমদ সাহারানপূরী (রহ.) ও শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া (রহ.)-এর হাদীস চর্চা কেবল ভারতীয় উপমহাদেশে নয়, গোটা দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য দিক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করে চলেছে। এসব মনীষী ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনা ও ভুল আক্বীদা-বিশ্বাসের সংশোধন যেমন করেছেন তেমনি কোটি কোটি মানুষকে সীরাতুল মুস্তাকিমের আলোকিত পথও দেখিয়েছেন। সত্যিকার অর্থে আকাবীরে দেওবন্দ ছিলেন সত্যসন্ধানী মানুষের আদর্শ, সুন্নাতে রাসুলের প্রতিচ্ছবি, ইলমে নববীর ধারক, দ্বীনি শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী এবং অপশক্তির বিরুদ্ধে নিরাপোষ যোদ্ধা। দেওবন্দী চিন্তাধারার উলামা মাশায়েখদের সবচে' বড় অবদান দ্বীনী শিক্ষার বিকাশ, দ্বীনের দাওয়াত, তাওহীদ ও সুন্নাতের প্রতিষ্ঠা, শিরক বিদআতের প্রতিরোধ। গোটা দুনিয়ার আনাচে কানাচে দেওবন্দী ধারার লাখ লাখ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এ আদর্শকে লালন করেই। আকাবিরে দেওবন্দের ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সাধনা ও অবদানের ইতিহাস যতবেশী চর্চা হবে আদর্শিক সমাজ বিনির্মাণের সংগ্রামী প্রয়াস ততবেশী জোরদার হবে।

মুসলিম উম্মাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান, বিদগ্ধ গবেষক আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) বিরচিত 'আকাবীরে দেওবন্দ : ইতিহাস ও ঐতিহ্য' গ্রন্থটি অধ্যয়নের সুযোগ হয়েছে। বিজ্ঞ গ্রন্থকার দেওবন্দী উলামা মাশায়েখদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন সাধনা ও অমূল্য অবদান তাঁর শক্তিশালী কলমে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন। মূল উর্দূ ভাষায় লিখিত গ্রন্থটি বাংলায় ভাষান্তর করেন

আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদভী (রহ.) এর সুযোগ্য শিষ্য ও খলিফা মাওলানা জুলফিকার আলী নাদভী। অনুবাদের স্টাইল ঝরঝরে ও সাবলীল। অনুবাদে মূল ভাষার স্পিরিট রক্ষিত হয়েছে। ঢাকার মর্যাদাবান প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স'-এর পক্ষে প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুর রউফ সাহেব গ্রন্থটি মুদ্রণ ও প্রকাশনার দায়িত্ব নেয়ায় স্বস্তিবোধ করছি। আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। গ্রন্থের ছাপা মনোরম, কাগজ উন্নত ও প্রচ্ছদ যুৎসই। আমার প্রতীতি বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি যৌক্তিক বিচারে পাঠকবর্গ লুফে নেবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবকর্ম প্রয়াস সফলতায় ভরে দিন- আমীন।

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ওমরগণি এম ই এস (ডিগ্রী/অনার্স) কলেজ
চট্টগ্রাম।
E-mail: drkhalid09@gmail.com

অনুবাদকের আরজ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام علي سيد الانبياء و المرسلين و علي اله و اصحابه و من تبعهم باحسان الي يوم الدين اما بعد!

এ মুহূর্তে অধমের দিল ও দেমাগ, কলব ও কলম, অস্থি-মজ্জা সিজদাবনত হয়ে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের দরবারে লক্ষ কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছে। কারণ, তিনি তাঁর এ অধম বান্দাকে দিয়ে দ্বীনের কাজ করার তাওফিক প্রদান করেছেন। বর্তমান যমানাতে দ্বীনের কাজ করতে পারা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়।

আমার মুরশিদ ও মাখদূম ইসলামী চিন্তার পথিকৃৎ আওলাদে রসূল আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী হাসানী নাদবী (রহ.) ও তাঁর গ্রন্থসমূহকে পরিচয় করিয়ে দেবার আর প্রয়োজন নেই। কারণ, বর্তমান বিশ্বে সকল শ্রেণীর মুসলমান, দ্বীন দরদী ও দ্বীনের মুখলিস খাদেমগণ তাঁর গ্রন্থ হতে ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছেন। ফলে, তা আলোর মশাল ও হীরার জ্যোতি 'সিরাজুম মুনীরা'-র ভূমিকা পালন করছে।

বর্তমান বিশ্বে হক ও বাতিলের লড়াই চলছে। হকের পতাকা আল্লাহ্ তা'আলা শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর পরিবার ও তাঁর ছাত্রদের হাতে অর্পণ করেছেন। যাদেরকে আমরা 'আকাবিরে দেওবন্দ' ও 'আকাবিরে নাদওয়া' নামে জানি। এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ হওয়া আলিমগণ খালেস তাওহীদ ও সুন্নাত সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মরণপণ সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। সারা বিশ্বে তাদের খিদমতের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে এক শ্রেণীর মানুষ তাদের সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করছেন। ফলে, আরব বিশ্বের জনগণ তাঁদের খিদমত সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হচ্ছিল না। এ বিষয়টি আমাদের হযরত আল্লামা নাদভী (রহ.)-কে বড়ই পীড়া দিচ্ছিল। তাই, তিনি ভারতবর্ষের 'আকাবিরে দেওবন্দ' ও 'আকাবিরে নাদওয়া' কর্তৃক পরিচালিত দ্বীনি খিদমত ও তাঁদের অবদানের উপর আলোকপাত করে আরবীতে 'আল-আদওয়া' নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন এবং আমাদের সামনে তুলে ধরেন। আরব বিশ্বের কোথাও সফরে গেলে তা সাথে নিয়ে যেতেন এবং বিতরণের ব্যবস্থা করতেন।

গ্রন্থটি বহু দিন যাবত অনুবাদ করার ইচ্ছা পোষণ করে আসছিলাম। কিন্তু এর কোন কপির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। আল্লাহর মেহেরবানীতে হঠাৎ একদিন একটা কপি হস্তগত হলো। আর তখনই অনুবাদ করা শুরু করে দিলাম। অনুবাদ শেষ হলে তা প্রকাশের চিন্তা করতে থাকি। মুহাম্মদ ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রউফ সাহেব তা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আল্লাহ্ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, দারুল উলূম দেওবন্দে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে হযরত আল্লামা নাদবী (রহ.) দু'টি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা দু'টি গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য থাকার কারণে অনুবাদ গ্রন্থের সাথে সংযুক্ত করা হলো।

গ্রন্থটি প্রকাশের কাজে অনেকই বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ্ সকলকে উত্তম জাযা দিন।

পরিশেষে আল্লাহ্র নিকট দু'আ করি, তিনি যেন মূল গ্রন্থের মতই অনুবাদ গ্রন্থটিও কবূল করেন এবং এর সাওয়াব আমার মুরশিদ হযরত আল্লামা নাদভী (রহ.)-কে বখশীশ করেন। আমীন।

আগস্ট, ২০১৬ খ্রী. ঢাকা

বিনীত

জুলফিকার আলী নাদবী
৮৫/১০ লেইন, কদমতলা, পূর্ব বাসাবো
ঢাকা

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام علي سيد الانبياء و المرسلين و علي اله و اصحابه و من تبعهم باحسان الي يوم الدين اما بعد !

ভারতবর্ষে এমন কিছু দ্বীনী ও দাওয়াতী আন্দোলন রয়েছে, যার কর্মের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং তার শিকড় অত্যন্ত সুদৃঢ় ও তার প্রভাব অনেক গভীর। এখানে এমন কিছু দ্বীনী তা'লীম ও তরবিয়তের প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের হিফাযত ও তার তা'লীম ও তাদরীস এবং প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। ভারত উপমহাদেশে ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি করতে, জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক দ্বীনী চেতনা জাগ্রত করতে এবং শরীআত প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে এ সকল প্রতিষ্ঠান মৌলিক ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু কিছুদিন যাবত তাদের আকীদা-বিশ্বাস, কুরআন ও হাদীসের সাথে তাদের সম্পর্ক এবং শরীআতের উপর তাদের 'আমলের ব্যাপারে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করার অপতৎপরতা শুরু হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের প্রোপাগান্ডা ও সমালোচনার তুফান সৃষ্টি করা হচ্ছে। মিথ্যা ও বানোয়াট অপবাদ প্রদান করে তাদের গৌরবময় ইতিহাসে কালিমা লেপনের অপচেষ্টা চলছে। আর এসবকিছু হচ্ছে শুধু মাত্র কোন দলীয় ফায়দা হাসিলের জন্য বা কোন ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থ করা অথবা কোন বিশেষ মহলকে সুবিধা প্রদানের জন্য বা কোন বিশেষ আন্দোলনের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য। এ অপতৎপরতার কারণে ঐ সকল সুগভীর ও ব্যাপক প্রভাবের অধিকারী দ্বীনী আন্দোলন ও দাওয়াতী কর্মতৎপরতা ও ইসলাহী প্রচেষ্টার ব্যাপারে বিষোদগার ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছে এবং ঐ সকল দ্বীনী, তালীমী ও তারবিয়তী কেন্দ্রসমূহের বিরুদ্ধে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করা হচ্ছে। অথচ এ সকল আন্দোলন সহীহ দ্বীনের হিফাজত ও তার উপর দৃঢ়তার সাথে আমল এবং ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাসকে শির্ক ও বিদ'আতের মিশ্রণ হতে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সাথে সাথে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণীকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করা, দ্বীনী ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা, ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা, ইসলামী বৈশিষ্ট্য ধ্বংসকারী শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করা,

ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রচার-প্রসার করা এবং মুসলিম পারিবারিক আইন সংরক্ষণের জন্য আন্দোলন করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

এমন নাজুক পরিস্থিতিতে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব করা ছাড়া সঠিকভাবে ইতিহাসের আলোতে পূর্ণ আমানতদারীর সাথে এ সকল দাওয়াতী ও ইসলাহী আন্দোলন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ফিকরী ও তরবিয়তী কেন্দ্রসমুহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেশ করা লেখক নিজের নৈতিক দায়িত্ব বলে অনুভব করেন। কুরআন ও হাদীসের সাথে জনসাধারণের সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং তাদের আক্বীদা সহীহ করা, দিলে শির্ক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এ সকল আন্দোলন ও মাদরাসাসমূহ যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে, তার প্রতি আলোকপাত করা জরুরী মনে করে। যাতে পাঠক এ সকল বিষয়ে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত দাওয়াতী ও ইসলাহী আন্দোলন, তা'লিমী ও তরবিয়তী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং এর সাথে সম্পৃক্ত মহান মনিষীগণের দ্বীনী খিদমত ও অবদান সম্পর্কে অবহিত হতে সক্ষম হয়। তাদের ইসলাহী প্রচেষ্টা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে এবং আক্বীদা পরিশুদ্ধি করার ক্ষেত্রে তাদের কুরবানী ও বিস্ময়কর সফলতার বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয় এবং এ সম্পর্কিত সঠিক তথ্য ও ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ তাদের সামনে এসে যায়। কারণ, পাঠক নিজেই এ সম্পর্কিত সঠিক তথ্য ও ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের আলোতে ঐ সকল সংশয়, অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় অপপ্রচারের ব্যাপারে সহজেই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এসকল সমস্যা ও সংকট এমন দেশের ব্যাপারে সৃষ্টি করা হচ্ছে, যে দেশ ইসলামের প্রাণকেন্দ্র হতে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত এবং যেখানে মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি ও ভাষাকে নির্মূল করার প্রচেষ্টা চলছে, যেখানে মুসলমানদের ধর্মীয় ও অর্থনৈতিকভাবে দেওলিয়া করার ষড়যন্ত্র চলছে, যেখানে তাদের শিক্ষানীতিতে হস্তক্ষেপ শুরু হয়েছে, হিন্দীকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, মুসলিম পার্সোনাল ল'-এর পরিবর্তে সকল নাগরিকের জন্য এক ধরনের আইন বাস্তবায়ন করতে বদ্ধপরিকর, উর্দূ ভাষাকে উৎখাত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। মোটকথা, সে দেশকে দ্বিতীয় স্পেন বানাবার যাবতীয় নীল-নকশা প্রস্তুত করা হয়েছে।

এ ধরনের দেশ সম্পর্কে ঐ সকল অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় সংশয় অপপ্রচারকারীদের সম্পর্কে এবং কল্যাণকর ও প্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ ও

দাওয়াতী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অপবাদ প্রদানকারী এবং তা দ্বারা নিজেদের দলীয় ফায়দা হাসিলকারীদের সম্পর্কে কুরআনুল কারিমের আলোতে এ আহবান করা সমুচিত হবে :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ۔

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানের জন্য দাঁড়িয়ে যাও, ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারীতে পরিণত হও এবং কোন জাতির সাথে বিদ্বেষের কারণে তোমরা ইনসাফ ত্যাগ করো না। বরং ইনসাফ করো, কারণ এটি তাকওয়ার অধিক নিকটতম। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমরা যা কর সে সম্পর্কে সম্যক খবর রাখেন। [সূরা মায়িদা : ৮]

আবুল হাসান আলী নাদবী

২৬ শে জিলক্বদ
মুতাবেক ১৫ই এপ্রিল, ১৯৯৬ ঈসায়ী

আক্বীদাগত ও আমলী ত্রুটি

অমুসলিমদের সাথে মেলামেশা এবং কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার ঘাটতির কারণে মুসলমানদের কিছু আক্বীদাগত ও আমলী ত্রুটি

ভারতবর্ষের পুরাতন ইতিহাসের উপর যাদের কিছু জ্ঞান আছে, তারা এ বিষয়টি খুব ভালো করে জানে যে, ভারতবর্ষ মূর্তিপূজার সাথে অত্যন্ত গভীর ও প্রাচীন সম্পর্ক রাখে। মূর্তিপূজা এখানে নতুন কোন বিষয় নয়; বরং এটাই তার লীলাভূমি এবং এখানেই এর ক্রমবিকাশ ঘটেছে। এদেশের সকল ধর্ম ও জীবন দর্শন, এখানকার সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিল্প-কলা ও সাহিত্য, সামাজিক রীতি-নীতি এবং গণিতশাস্ত্র থেকে শুরু করে সৌরবিদ্যা পর্যন্ত সর্বত্রই এর ঘ্রাণ পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষ মূলত দেবদেবীদের স্বর্গরাজ্য, রূপকথা ও কল্প কাহিনীর দেশ, মেলা ও উৎসবের দেশ। এ দেশে শোকের মাতম হয়। এ দেশে জন্ম-উৎসবও পালন করা হয়, আবার শোক-দিবসও পালন করা হয়। মোট কথা, এ দেশে প্রতিদিন ও প্রতি মুহূর্তে কোন না কোন উৎসব পালন করা হয়। ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব অথবা রূপকথার নায়কদের নিয়ে উৎসব পালন করার রেওয়াজ এদেশে নতুন নয়।

প্রথম যুগে ভারতীয় মুসলমানদের সাধারণ জীবনে, রসম-রেওয়াজে, সামাজিক আচার-আচরণে, বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতের সনাতন সভ্যতা কিছু না কিছু প্রভাব ফেলেছে এবং মুসলিম শাসকদের উদাসীনতা, কুরআন ও হাদীসের প্রতি মনোনিবেশ না করা, হাদীসের গ্রন্থসমূহের অপ্রতুল হওয়া, স্ব-দেশী লোকজনের সাথে মেলা-মেশা ও ঘনিষ্টতা এবং বিভিন্ন রসম রেওয়াজ ও সামাজিক অনুষ্ঠানে স্বাধীনভাবে শরীক হওয়ার কারণে মুসলিম সমাজ-ব্যবস্থায় তা যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিলো। আবার অনেকক্ষেত্রে মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা ও জীবনযাত্রার সাথে তা মিশে গিয়েছিলো। ফলে, আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করার জন্য মুসলিহ্ ও মুজাদ্দিদগণের একটি জামাত সৃষ্টি করেন। এ ধারায় প্রধান সিপাহসালার হলেন মুজাদ্দিদে আলফে সানী হযরত শায়খ আহমদ ইবন আব্দুল আহাদ সেরহিন্দ ও তাঁর সম্মানিত খলীফাগণ। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী

(রহ.)-এর ইন্তিকালের পরে এ জামাতের নেতৃত্ব প্রদান করেন হযরত শাহ্ ওলিউল্লাহ্ দেহলবী (রহ.)। অতঃপর তাঁর পরিবারের সদস্যগণ এবং তাঁর সুযোগ্য মুহাদ্দিস, ফুকাহা ও মুসলিহ ছাত্রগণ এ দায়িত্ব পালন করেন।

অমুসলিম সভ্যতা-সাংস্কৃতির প্রভাব শুধুমাত্র ভারতীয় মুসলিমদের জীবনে পরিলক্ষিত হয় না। যদিওবা তারা ইসলামের প্রাণকেন্দ্র হতে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থান করছে এবং যেখানে ইসলাম বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী, অঞ্চল ও কঠিন অবস্থা অতিক্রম করে এখানে পৌঁছেছে। আর এ কারণে ইসলামের মূল শক্তি ও স্প্রীট এবং তার বাস্তবতা ও মৌলিক রূপরেখার মাঝে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুত এগুলোই ছিলো ইসলামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অনৈসলামী সভ্যতা দ্বারা মুসলমানদের জীবন-পদ্ধতি প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি স্বয়ং আরব বিশ্বেও পরিলক্ষিত হয়। কারণ, হিজরী সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমানরা অমুসলমানদের সাথে অধিক পরিমাণে মেলা-মেশা করতে থাকে। অনারবদের অধিক হারে আসা-যাওয়া, অনারব জাতি-গোষ্ঠীর ইসলাম কবূল করা এবং তাদের কিছু কিছু রসম-রেওয়াজ, রীতি-নীতি এবং তাদের অবশিষ্ট জীবন-পদ্ধতিসহ ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মিসর ও সিরিয়াতে বাতেনী ও ইসমাঈলী ফিরকা ক্ষমতার মসনদে থাকার কারণে এবং ধর্মহীন তথাকথিত সূফীদের ভুল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কারণে কিছু কিছু আরবদেশে এবং বিভিন্ন মুসলিম দেশে মুসলমানদের জীবনযাত্রা, চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে অনৈসলামী প্রভাব পড়তে থাকে এবং অন্যান্য ধর্ম ও মতাদর্শের মনগড়া কথাবার্তা ইসলামী সমাজে অনুপ্রবেশ করতে থাকে।

আল্লামা ইবন তাইমিয়া (রহ.)-এর কিতাব 'আর-রাদ্দু আলাল বকরী' এবং "আর-রাদ্দু আলালণ্নাখনায়ী" অধ্যায়ন করা দ্বারা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় যে, মুসলিম ইমাম ও মাশায়েখগণ এবং ওলীউল্লাহ ও পীর বুযর্গের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে সাধারণ অশিক্ষিত লোকজন সীমাহীন বাড়াবাড়ি করত এবং এক্ষেত্রে তাদের রীতি-নীতি ও জীবন পদ্ধতি জাহিলী যুগের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলো।

যুহ্দ ও ইবাদতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি এবং বিশেষ ব্যক্তিদের ব্যাপারে সীমাহীন ভক্তি ও মুহব্বত, সম্মান-শ্রদ্ধার প্রভাব আজও বিভিন্ন মুসলিম দেশে দেখা যায়। এ সকল প্রভাব-প্রতিপত্তিকে একমাত্র ইসলামী দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনই দুর করতে সক্ষম। তবে, তা অবশ্যই হিকমত ও সাহসিকতার সাথে হতে হবে।

মুজাদ্দিদে আলফে সানী ইমাম আহমদ ইবন আব্দুল আহাদ সেরহিন্দী (৯৭১-১০৩৪ হি.)

মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কঠিন ভূমিকা পালন করেন। তিনি শির্কী কাজকর্ম, জাহিলী রসম-রেওয়াজ ও আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন। কারণ, এগুলো ভারতবর্ষে স্বতন্ত্র ধর্ম ও শরীআতের রূপ ধারণ করেছিলো। তাই তিনি 'বিদ'আতে হাসানা' নামের সকল বস্তুকে অস্বীকার করেন এবং তা আমলযোগ্য হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তিনি ভারতবর্ষের নড়বড়ে ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বাদশাহ আকবরের যুগে সৃষ্ট অনৈসলামী প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধ্যান-ধারণাকে অত্যন্ত সৎসাহসিকতা ও হিকমতের সাথে মোকাবিলা করেন এবং দ্বীনের তাজদীদ ও সংস্কার করার পাশাপাশি বাস্তব জীবনে পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে হিকমতপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফলে, বাদশাহ মুহিউদ্দীন আওরঙ্গজেব ইসলামী বাদশাহ্ আলমগীররূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি আমলী, আইনী ও ব্যবস্থাপনার দিক থেকে ভারতে ইসলাম ও মুসলমানদের সংরক্ষকের ভূমিকা পালন করেন। তার ব্যাপারে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর সাহেবযাদা হযরত খাজা মুহাম্মদ মাসুম (রহ.)-এর ভবিষদ্বাণী ও ঈমানী দূরদৃষ্টি সঠিক প্রমাণিত হয়। কারণ, হযরত (খাজা) মাসুম (রহ.) বাদশাহ আলমগীরকে শৈশবকালে লেখা একটি চিঠিতে 'শাহ্যাদায়ে দ্বীনপানাহ্' উপাধি প্রদান করেন এবং এ নামে তাঁকে ডাকতেন।

মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) বিদ'আত ও সুন্নাতের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য করেন, তিনি মুজতাহিদগণের কিয়াস এবং মুতাআখ্খির আলিমগণের ইস্তিহসান এবং প্রথম ও পরবর্তী যুগের আমল ও কর্মতৎপরতার মাঝে পার্থক্য ও বিশেষত্ব প্রমাণ করেন।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) সব সময় প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রহণের দাওয়াত প্রদান করতেন এবং সকলকে সুন্নত আমলের শিক্ষা দিতেন। তিনি মুনকার ও শরীআত বিরোধী কাজের প্রতি তিরস্কার করতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কখনোই বাদশাহ আকবরকে ভয় করতেন না এবং হক কথা বলা হতে কখনোই বিরত থাকতেন না। দ্বীনের ব্যাপারে কোন তিরস্কারকে পরোয়া করতেন না।

বরং তিনি সরকারি কর্মকর্তা ও মন্ত্রীবর্গকে স্বাধীনভাবে সংশোধনের চেষ্টা করতেন। দ্বীনি বিষয়ে তাদের দিক-নির্দেশনা প্রদান করতেন এবং শীআদের সংস্পর্শ গ্রহণে তাদেরকে নিরুৎসাহিত করতেন। ইসলাম বিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে তাদের দিলে ঘৃণা সৃষ্টি করতেন এবং সবসময় তাদের কল্যাণ কামনা করতেন। আল্লামা ইকবাল (রহ.) দু'টি চরণের মাধ্যমে এ ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে অত্যন্ত সঠিক ও সুচারুভাবে প্রকাশ করেছেন–

وہ ہند میں سرمایۂ ملت کا نگہبان

اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار

"তিনি ছিলেন ভারতীয় মুসলমানদের নেগাবান

আল্লাহ্ যাঁকে সবসময় করেন খবরদার।"

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানি (রহ.) এর দাওয়াতী ও ইসলাহী কর্ম-তৎপরতার কারণে ভারতবর্ষে এক ধরনের ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি হয়। আকিদাগত বিষয়ে এক ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি হয়। রাজা-বাদশাহ ও আমীর-উমারাদের জীবনে পরিবর্তন সাধিত হয় এবং তাদের পরিবর্তনের কারণে জন-জীবনে দ্বীনি প্রভাব পড়ে। আক্বীদার সংশোধন হয়, শির্ক ও বিদ'আতের কোমর ভেঙ্গে যায়। এর প্রভাবে ভারতবর্ষে ইসলাম আসল ও বাস্তব আকৃতিতে স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করে।

মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) যখনই কুরআন ও সুন্নাহ এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রসিদ্ধ আক্বীদা বিশ্বাসের বিপরীত কোন সূফী সাধকের গবেষণা বা তাদের হালত শুনতেন এবং এর সপক্ষে দলীল হিসেবে তাসাউফের কোন কিতাব অথবা কোন বুযর্গের কথা ও কর্মকে পেশ করা হতো, তখনই তার দ্বীনি অনুভূতিতে জোশ এসে যেত এবং তার ফারুকী রক্ত ধমনীতে তৎপর হয়ে পড়ত। ফলে, তিনি কলমের মাধ্যমে শরীআতের হিফাযত ও সুন্নাতের হক্কানিয়তের বিষয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। একবার তাঁর কোন এক ঘনিষ্ঠ জন কোন বিষয়ে জনৈক সূফী দার্শনিক শায়খ আব্দুল কাবীর ইয়ামানীর কোন মত বা দর্শন পেশ করেন যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী ছিল। তখন হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (রহ.) এ ধৃষ্টতা বরদাশত করতে পারলেন না এবং সাথে সাথে তাঁর কলম থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে এ বাক্য বের হয়ে আসে : "মাখদুমা! অধম ঐ ধরনের কথাবার্তা শ্রবণের ধৈর্য রাখে না। বে-এখতিয়ার আমার ফারুকি ধমনীতে শিহরণ

সৃষ্টি হয় এবং এর সুন্দর কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ দেয় না। এ ধরনের মতামত শায়খ আকবর শামী-এর হোক, তাতে কিছু যায়-আসে না। কারণ, এ ব্যাপারে আমাদের মুহাম্মাদ আরাবী (সা)-এর হাদীস প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে মুহিউদ্দীন ইবন আরাবী[১] অথবা সদরুদ্দীন কুনুভী এবং শায়খ আব্দুর রায্যাক ক্বাশী এর কথার প্রয়োজন নেই। আমাদের তো প্রয়োজন শরীআতের 'নস'[২]-এর, শায়খ আকবরের 'ফুস' এর প্রয়োজন নেই। ফাতুহাতে মাদানী আমাদেরকে 'ফাতুহাতে মাক্কীয়া'[৩] থেকে বিমুখ করে দিয়েছে।

---

১. মুহিউদ্দীন আরাবী শায়খে আকবর নামে প্রসিদ্ধ। তিনি মূলত মরিসাশে ৫৬০হি. জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৬৩৮ হি. দামেশকে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানে তাঁকে দাফন করা হয়।

২. 'নস' দ্বারা উদ্দেশ্য, শরীআতের দলীল-প্রমাণ এবং 'ফুস' দ্বারা উদ্দেশ্য শায়খ আকবরের কিতাব 'ফুসূসুল হিকাম'।

৩. শায়খ ইবন আরাবীর কিতাব ফুতূহাতে মাক্কীয়া উদ্দেশ্য। এটি কাল্পনিক গবেষণা ও রহস্য নিয়ে লেখা একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এ গ্রন্থে 'ওহাদাতুল ওয়াজুদ'-এর আকীদা-বিশ্বাস রয়েছে এবং এ ধরনের বিভিন্ন কল্পনাপ্রসূ গবেষণা রয়েছে যা শরীআত ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত-এর আকীদা পরিপন্থী।

হাকিমুল ইসলাম শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (রহ.)

শায়েখ আহমদ ইবন আব্দুর রহীম দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হি.) শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ নামে পরিচিত। তিনি সংস্কার ও সংশোধনীর কাজকে সামনে এগিয়ে নেন। তাঁকে ইমাম গাযালী ও শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা (রহ.)-এর মত হাকিমুল ইসলাম ব্যক্তিদের মধ্যে গণনা করা হয়। তিনি ভারতীয় মুসলমানদের জীবনের পাঁচটি দুর্বলতা চিহ্নিত করেন এবং তা সংশোধনের জন্য এ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর ইসলাহ ও সংস্কার ও সংশোধনের কর্ম পদ্ধতি :

১. মুসলমানদের একটি বড় অংশ তাওহীদের সঠিক অর্থই জানে না। বরং তারা অনৈসলামী রসম-রেওয়াজের মাঝে ডুবে রয়েছে এবং বাতিল চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার দ্বারা প্রভাবিত। তাই, প্রয়োজন ছিল তাওহীদের সঠিক অর্থ তাদের সামনে পেশ করা এবং ইসলামের প্রকৃত রূপ তাদের সামনে উপস্থাপন করা, জাহিলী যুগের মুশরিকানা আক্বীদা-বিশ্বাস ও ইসলামী আকীদা তথা তাওহীদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য ফুটে উঠে।

২. মুসলমানদেরকে পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের সাথে সরাসরি সম্পর্ক করে দেয়া। যদিও উলামায়ে কিরাম এ কথা মনে করেন যে, যদি সাধারণ মানুষের জন্য পবিত্র কুরআন বুঝা অত্যন্ত কঠিন এবং সাধারণ জনগণ যদি সরাসরি পবিত্র কুরআন পড়তে ও বুঝতে থাকে, তাহলে তা দ্বারা তাদের ইলমী আধিপত্য ও রূহানী নেতৃত্ব বিপদের সম্মুখীন হবে। ফলে, তারা সবসময় সাধারণ মুসলমানগণকে পবিত্র কুরআন অধ্যায়ন করা থেকে বিরত রাখত। তারা কখনই সাধারণ জনগণকে কোন প্রকার মাধ্যম ছাড়া কুরআনে পাক বুঝার সুযোগ দিত না। আর এ কারণে তারা কখনো দেশীয় ভাষায় বা আঞ্চলিক ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করেননি এবং হাদীসের কিতাবের ব্যাপক প্রচলন ঘটতে দেয়নি। ফলে, সাধারণ মুসলমান কুরআন ও হাদীস থেকে দূরে থাকত। আর তাই তিনি উপলব্ধি করলেন যে, কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ স্বদেশী ও জনগণের ভাষায় অনুবাদ করার এবং হাদীসের কিতাবের গুরুত্বের সাথে প্রচার ও প্রসার করার প্রয়োজন রয়েছে, যাতে সাধারণ জনগণ সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে উপকৃত হতে পারে।

৩. ভারতীয় উলামায়ে কিরামের দ্বীনি ইলম বিশেষত হাদীসের ইলম ও জ্ঞান অতি সীমিত ছিল। আর এ কারণে আক্বীদার ইসলাহ করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল। ফলে, শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (রহ.) সিয়াহ সিত্তাহ ও মুয়াত্তাকে অত্যন্ত গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং হাদীসের শিক্ষা, হাদীসের প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করেন। ফলে, তাঁর পরিবারের সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ইলমে-হাদীসের চর্চা, অধ্যয়ন এবং প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে ইসলামী জগতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৪. শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (রহ.) স্বীয় ইমাম সুলভ দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে মুসলিম বিশ্বে এমন একটি যুগ আসবে যা আকল ও বুদ্ধি-নির্ভর হবে, এমন এক বিপ্লব সাধিত হবে যা চিন্তা নির্ভর হবে। আর এ কারণেই তিনি ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী কর্মপন্থার উপকারিতা, প্রয়োজনীয়তা এবং ইসলামী শরীআত ও নববী শিক্ষার সুদৃঢ় ও বাস্তবধর্মী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা উচিত বলে মনে করতেন এবং ইসলামী খিলাফতের অবকাঠামো ও মানব সমাজ গঠনে ইসলামী কর্ম পদ্ধতির উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার যুক্তিসঙ্গত সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন। আর এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি 'হুজ্জাতুল্লা-হিল বালিগাহ' ও 'ইজালাতুল-খাফা ফী খিলাফাতিল খুলাফা'-এর মত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি কিংবদন্তী গ্রন্থ রচনা করেন। এ কিতাবদ্বয়ের তুলনা ইসলামী গ্রন্থাগারসমূহে এবং মুসলিম বিশ্বে অন্যান্য সুমহান গবেষণা ও গ্রন্থ ভান্ডারে পাওয়া মুশকিল।

৫. শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী (রহ.) এ বিষয়টি উপলব্ধি করেন যে, ভারতের রাজা-বাদশাহদের অন্দর মহলে এখন আর জীবনের উচ্ছ্বাস নেই, মোগল খান্দানের যুব সমাজের মাঝে দ্বীনি চেতনা ও নবজাগরণের আশা করা যায় না এবং এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে খালদূন (রহ.)-এর মন্তব্য হলো, "যখন কোন সরকারের উপর বার্ধক্য এসে যায় এবং তা যদি দূরীভূত করা অসম্ভব হয়, তাহলে এ অবস্থায় তাকে নতুন জীবন দেয়ার চেষ্টা করা এবং তার মাঝে নতুন শক্তি সৃষ্টি করার সাধনা করা এবং তার উপর বিদ্যমান অস্থিরতা দূরীভূত করার জন্য নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করা একেবারেই নিরর্থক। তাই এ নিরর্থক প্রচেষ্টার পরিবর্তে এমন এক জামাত প্রস্তুত করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত, যারা ইসলামী বিপ্লব সাধনে সহযোগী হয় এবং এমন একটি ইসলামী হুকুমত বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের যোগ্যতা ও সামর্থ্য ব্যয় করা উচিত, যা খালেস দ্বীনি ও ইলমী মূলনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.), তাঁর পরিবারের সদস্যগণ এবং তাঁর সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য উলামায়ে কিরাম একদিকে ইসলাহ ও তাজদীদের সুমহান দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুভাবে পালন করেন, অন্যদিকে তারা দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা এবং দ্বীনের তত্ত্ব ও রহস্যগুলোর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করে গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থগুলো শুধু যে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা ও ধ্যান-ধারণা পেশ করেছে এমন নয়, বরং তা ইসলামী বিপ্লব সাধন এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করেছে।

এ সকল হিকমতপূর্ণ প্রচেষ্টার ফলাফল

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.) ব্যক্তি প্রস্তুত করা, ব্যক্তিত্ব গঠন করা এবং রূহানী তাযকিয়া ও তরবিয়তের (আত্মার সংশোধন ও প্রশিক্ষণ) যে সুমহান দায়িত্ব পালন করেন, এর ফলে এমন কিছু ব্যক্তি প্রস্তুত হন যারা আল্লাহ্র দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করা, সুন্নতের পূনর্জীবন দান, শরীআতের প্রতিষ্ঠায় এবং বিদ'আত নির্মূল করার ক্ষেত্রে সুমহান দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা রাখতেন। আর এ কারণে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর পরে তাঁর সুযোগ্য সন্তান শাহ্ আব্দুল আযীয (রহ.) রূহানী, ইলমী ও দ্বীনি নেতৃত্বের যিম্মাদারী পালন করেন। তিনি শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করার পাশাপাশি গ্রন্থ রচনার কাজ করেন এবং এমন একদল ছাত্র তৈরি করেন যারা ইলমে হাদীসকে ব্যাপকহারে প্রচার ও প্রসার করে, দ্বীনের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং বিদ'আতের বিরূদ্ধে সোচ্চার সংগ্রামী জাগরণ সৃষ্টি করেন। তারা জনসাধারণকে কুরআন ও হাদীসের উপর আমল করার প্রকাশ্য দাওয়াত প্রদান করেন। তাযকিয়াতুন-নাফস ও আত্মশুদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা করেন। তাদের এ সকল প্রচেষ্টার কারণে অসংখ্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষের ঘরে ঘরে হাদীসচর্চা হয় এবং সর্বস্তরে শরীআত প্রতিষ্ঠিত হয়। আর মানুষের মাঝে দ্বীনের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার জযবা পয়দা হয়।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.) নিজের এ প্রচেষ্টা ও কর্মতৎপরতাকে শুধুমাত্র দাওয়াতী এবং ইলমী গন্ডির ভিতরে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং ভারতবর্ষে হিন্দুদের সাথে শত শত বছর যাবত সম্পর্ক রাখার প্রভাবে মুসলিম সমাজ যে সকল অনৈসলামী রীতি-নীতি, রসম-রেওয়াজ ও সামাজিক প্রথা অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, তার সুস্পষ্ট সমালোচনা করেন এবং কুরআন ও হাদীস থেকে দূরে থাকা, ভ্রান্ত মতবাদ, হাদীসের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা, উলামায়ে কিরামের অদূরদর্শিতা

এবং দ্বীনি অনুভূতি কম থাকার কারণে মুসলিম সমাজে যে ধরনের আখলাকি ও আক্বীদাগত ভ্রান্ত বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল তা মূলোৎপাটনের প্রচেষ্টা করেন।

শাহ্ আব্দুল আযীয (রহ.) এ সকল শির্ক আক্বীদা-বিশ্বাস, অনৈসলামী চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা, জাহিলী রসম-রেওয়াজ ও রূপকথা এবং অমুসলিমদের জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করা ও তাদের অনুসরণ করার বিরুদ্ধে কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যদিও সে সময়ে যে সকল আলিম-ওলামা যুক্তি বিদ্যা, দর্শন ও ফালসাফা চর্চায় নিজেদের মেধাকে ব্যয় করত তারা জনগণের বিরোধিতার ভয়ে এবং সংকটের আশংকায় ঐ সকল জাহিলী রসম-রেওয়াজের সমালোচনা ও বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকত।

সাইয়িদ আহমদ শহীদ রহ. (১২০১-১২৪৬ হি)

হিজরী ১৩ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বৎসরে সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রহ.) (১২০১-১২৪৬ হি) শাহ আব্দুল আযীয (রহ.)-এর বায়'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-কে সাথে নিয়ে ইসলাহ ও তাজদীদের কাজ করেন এবং নিজেদের পবিত্র কর্মতৎপরতা দ্বারা শীতল হৃদয়কে উজ্জীবিত করেন এবং কলুষিত হৃদয়কে আলোকিত করেন।

সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রহ.) খালেস তাওহীদের দাওয়াত প্রদান করেন, সুন্নতের উপর আমল করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন এবং শির্ক ও বিদ'আতের বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি মানুষকে ঈমান ও ইহতিসাব, যুহ্দ ও তাকওয়াময় জীবন যাপনের দাওয়াত দেন। এভাবে তিনি ভারতীয় মুসলিম সমাজের মাঝে দ্বীনি উদ্দীপনা ও জযবা ঢুকিয়ে দেন এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জান ও মাল কুরবানী দেওয়ার বিরল প্রেরণা সৃষ্টি করেন। এ ধরনের কুরবানী ও জযবার নযীর এ উপমহাদেশের শত বছরের ইসলামী ইতিহাসে পাওয়া মুশকিল।

সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রহ.) গোটা ভারতবর্ষে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে দাওয়াতী সফর করেন। ফলে, লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর হাতে তাওবা করে এবং তাঁর প্রচেষ্টায় মদের দোকান বন্ধ হয়ে যায় এবং মসজিদসমূহ আবাদ হয়ে যায়, শির্ক ও বিদ'আতের মূল আখড়া ধ্বংস হয়ে যায় এবং সে সময়ের বিখ্যাত ও বিজ্ঞ আলিম উলামা পঙ্গপালের ন্যায় তাঁর কাছে আত্মোৎসর্গ করেন।

১২৩৬ হিজরীতে তিনি হজ্জের উদ্দেশে বের হন। সে সময় ভারতের আলিমদের ফতওয়া ছিল যে, সমুদ্রের বিপদের কারণে ভারতের মুসলমানদের জন্য হজ্জ করা ফরয নয়। ফলে, তিনি হজ্জের মত ফরয হুকুম ভারতীয় মুসলমানদের নিকট হতে বিদায় হবার আশংকা করতে লাগলেন।[১]

যখন তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হন তখন তাঁর সাথে সাতশত সদস্য ছিল। যেদিক হতেই তিনি গমন করেন সেদিক হতেই হাজার হাজার মানুষ স্রোতের ন্যায় এসে তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করতেন এবং তারা গুনাহ থেকে, শরীআত

---

১. দেখুন সীরতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ ১ম খণ্ড

পরিপন্থী কাজ হতে এবং অনৈসলামিক আক্বীদা-বিশ্বাস ও রসম-রেওয়াজ হতে তাওবা করে পাক-পবিত্র জীবন যাপন করতেন। এর প্রভাবে হাসপাতালের যে সকল রোগী তাঁর কাছে আসতে সক্ষম হতনা তারা তাঁকে হাসপাতালে দাওয়াত করতেন এবং তওবা করতেন। বিভিন্ন স্তরের লোক পতঙ্গের মত তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়। হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর ওয়ায ও নসীহতের বরকতে লোকজনের ইসলাম কবূল করার প্রভাবে এবং শরীআতের সামনে আত্মসর্মপণ করার কারণে কলকাতার মত ইংরেজ নিয়ন্ত্রিত শহরে মদের কারবার বন্ধ হয়ে যায়। জুয়ার আসর লোকশূন্য হয়ে যায়। এক পর্যায়ে মদ বিক্রেতারা খরিদ্দার না থাকার কারণে সরকারকে ট্যাক্স দিতে অপারগতা প্রকাশ করে।

হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর থেকে আক্বীদাগত ও ইলমী, দ্বীনী, রূহানী এবং আখলাকী বিষয়ে উপকৃত হয়েছে এমন লোকের সংখ্যা গণনা করা ও আকাশের নক্ষত্র গণনা করা সমান কথা। তবে তাঁর হাতে যারা বায়'আত হয়ে তওবা করেছে এমন লোকের সংখ্যা ত্রিশ লাখের উপরে হবে এবং যারা তার হাতে ইসলাম কবূল করে ধন্য হয়েছে এমন লোকের সংখ্যা চল্লিশ হাজারের উপরে হবে।[১]

---

১. বিস্তারিত জানার জন্য লেখক কর্তৃক রচিত' সীরাতে সৈয়দ আহমদ শহীদ' ১ম খন্ড দেখুন

শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) (শা. ১২৪৬ হি)

শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তাহলো, তাঁর সম্পর্কে শায়খ মুহসিন ইবন ইয়াহইয়া তিরহাটী স্বীয় গ্রন্থ 'আল-ইয়ানিউল জানী'-তে উল্লেখ করেন যে, "শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) দ্বীনের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তিনি সুন্নাতের প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন এবং সুন্নাতের বিপরীত কোন কাজ হতে দেখলে খবুই অসন্তুষ্ট হতেন। তিনি সব সময় বিদ'আতের বিরূদ্ধে কথা বলতেন এবং প্রকাশ্যে বিদ'আতীদের সমালোচনা করতেন।"

আমীরুল মালিক নওয়াব সৈয়দ সিদ্দীক হাসান খান কানূজী (মৃ. ১৩০৭ হি.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-হিত্তাহ-বিযিকরি সিহাহিস সিত্তাহ'-তে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.)-এর কথা আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন যে, 'শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর পৌত্র ইসমাঈল শহীদ (রহ.) সুন্নাতকে কাজে ও কথায় বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে তাঁর দাদার পথ অনুসরণ করেন। দাদা যে কাজের সূচনা করেছিলেন, পৌত্র তার পূর্ণতা প্রদান করেন। তাঁর উপর যে সকল দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল, তিনি তা পালন করেন। তবে তাঁর দায়িত্ব অন্যদের দ্বারা আজো পর্যন্ত আদায় হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নেক আমলসমূহ এবং দ্বীনী বিষয়ে চূড়ান্ত কথাবার্তাসমূহকে কবূল করুন এবং তাঁর কর্মের উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। তিনি ধর্মের বিষয়ে নতুন কিছু আবিস্কার করেন নি, যেমনটি জাহিলদের ধারণা। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ۔

"কোন মানুষের কাজ নয় যে, তাকে কিতাব ও হিকমত এবং নবূয়ত প্রদান করলে সে বলবে যে, তোমরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে আমার ইবাদত কর। বরং তাদের উচিত, তারা বলবে যে, তোমরা আল্লাহ্ওয়ালা হয়ে যাও। এ জন্য যে, তোমরা অন্যকে কিতাব শিক্ষা দাও এবং নিজেরা কিতাব পাঠ কর।"

[সূরা আলে ইমরান : ৭৯]

তিনি অসংখ্য মৃত সুন্নাতকে জীবিত করেন, শির্ক-বিদ'আতের মূলোৎপাটন করেন এবং অনৈসলামী রসম-রেওয়াজ ও রীতি-নীতি এবং সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। আর এভাবে তিনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় শাহাদত বরণ করেন।

আর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তাকবিয়াতুল ঈমান' আক্বীদা ও তাওহীদের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলীল এবং তা হকপন্থীদের প্রামাণিক গ্রন্থে পরিণত। এ কিতাবের মাধ্যমে ভারতবর্ষে অসংখ্য জনগোষ্ঠী উপকৃত হয়েছে, যাদের সংখ্যা চল্লিশ লাখের ঊর্ধ্বে হবে। এ গ্রন্থ এমন এক মহান ব্যক্তির কলম থেকে রচিত, যিনি মুসলমানদের হালত ও জীবন পদ্ধতিতে শির্কী রীতিনীতি ও তাদের পরিবারের জাহিলী রসম-রেওয়াজ দেখে মর্মাহত হতেন। এরই সাথে যখন তিনি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী শরীআত বাস্তবায়ন করার জন্য জিহাদের ময়দানে তপ্ত খুন ঢেলে দেখায় এবং রাতের নির্জনতায় অশ্রুর বন্যা বইয়ে দেয়ার কারণে এ কিতাবের শক্তিশালী প্রভাব আরো অধিক হয়েছে।

শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর বড় বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ইবাদত করতেন আবার তাঁর কাছে দ্বীনের চেতনাবোধ ছিল, তরবারি চালাতেন আবার কুরআন পাকের তিলাওয়াত করতেন, তাঁর কাছে হেকমত ছিল আবার আত্মমর্যাদাবোধ ছিল, যুদ্ধের ময়দানে তাঁর হাতে তরবারির ঘর্ষণে বিদ্যুত চমকাত আবার রাতের আঁধারে তাসবীহের দানা নিয়ে তাসবীহ পাঠ করতেন। তিনি দিনের বেলায় দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতেন এবং রাতের আঁধারে আল্লাহ্‌র দরবারে ক্রন্দন করে দু'আ ও মুনাজাত করতেন। তিনি সর্বদা হক কথা বলতেন এবং হকের পথে শাহাদতবরণ করেন। বস্তুত এটিই ছিল সততার চূড়ান্ত দলীল এবং পরিপূর্ণ ওফাদারী, ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের প্রমাণ।

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ـ

"মুমিনদের মধ্যে অসংখ্য মুমিন এমন রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কৃত ওয়াদা সত্য প্রমাণিত করেছে এবং তাদের কেউ কেউ তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে এবং কেউ কেউ এর অপেক্ষায় রয়েছে। আর তারা এর মাঝে কোন প্রকার পরিবর্তন সাধন করেনি।" [সুরা আহযাব : ২৩]

এ কিতাবের মাঝে এমন প্রভাব ও যাদু রয়েছে– যা শুধু কিছু কিছু আকাবিরের কিতাবে পরিলক্ষিত হয়। মুলত এর কারণ হলো এ কিতাবে সুস্পষ্টভাবে তাওহীদের আলোচনা করা হয়েছে, আধ্যাত্মিক রোগ নির্ণয় করা হয়েছে, শির্কের স্বরূপ উদঘাটন করা হয়েছে এবং যখমের উপর প্রলেপ দেয়া হয়েছে। এরই সাথে তৎকালীন যুগের মুসলমানদের আক্বীদাগত ত্রুটি, যুহুদ ও ইবাদতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি এবং ওলী ও পীর-বূযর্গদের সীমাহীন সম্মান প্রদর্শন করার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করা হয়েছে।

সে সময়ের সাধারণ মুসলমানদের স্বভাব ছিল তারা ঐ সকল বয়ানের প্রতি সামান্য ভ্রুক্ষেপ করত না, যা সাধারণভাবে করা হত এবং যে সকল রচনায় তাওহীদের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হত, তাদের মাঝে বিদ্যমান রোগসমুহের চিহ্নিত করা না হলে, তাদের থেকে প্রকাশিত শির্ক আক্বীদা-বিশ্বাসের ও কর্মসমূহের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা না হলে এবং ঐ সকল স্থান ও মণীষিগণের সুস্পষ্ট আলোচনা না করা হলে তাদের ব্যাপারে তারা বাড়াবাড়ি করত। এ ধরনের বয়ান ও রচনার প্রতি তারা দৃষ্টি প্রদান করত না। বরং তারা মনে করত যে, এ বক্তা যা কিছু আলোচনা করেছেন এবং এ রচনাতে যা কিছু লেখা হয়েছে, তা অন্যদের জন্য রচনা করেছেন আর অন্যদের জন্য বয়ান করেছেন। কিন্তু বক্তা ও সংস্কারক তাদের মধ্যে থাকা রোগের কথা যখন আলোচনা করেন এবং লেখক যদি তাদের মাঝে লালিত পালিত শিরকের বিরুদ্ধে কলম চালনা করেন, তাহলে তাদের চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করে এবং প্রতিশোধের স্পৃহায় তাদের বক্ষে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হতে থাকে।

এ হক কথা বলা ও লেখার কারণে বক্তা ও লেখককে বিরাট বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু যে সমস্ত ধর্ম প্রচারক সব সময় আখিরাতের চিন্তায় বিভোর থাকেন এবং নিজের আমলে ইখলাস রাখেন ও আল্লাহ্‌র কুদরতের উপর ইয়াকীন রাখেন যিনি দাওয়াত ও তাবলীগের জযবা বুকে ধারণ করেন, যিনি নবীগণের দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত আছেন, তিনি কখনই এ ধরনের অবস্থার কারণে পেরেশান হন না, বরং তাঁরা এ ধরনের নাজুক অবস্থাকে নিজেদের জন্য বরণ করে নেন এবং এভাবে পবিত্র কুরআনের উপর আমল করার সুযোগ লাভ করেন, স্বীয় রবের সন্তুষ্টি তালাশ করেন, নিজের দাওয়াত ও ইসলাহী কাজের যিম্মাদারী হতে মুক্তির আশা রাখেন এবং নিজের দিলের শান্তি ও আত্মপ্রশান্তির মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেন।

কুরআন-সুন্নাহ-এর শিক্ষা প্রদান ও হাদীসের উপর আমল করার ক্ষেত্রে প্রধান দু'টি দল

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর ছাত্র, খান্দানের পক্ষ হতে বিদ'আতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, আঞ্চলিক শির্কী রসম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, ইলমে হাদীসের প্রচার ও প্রসার করাকে নিজেদের মিশনে পরিণত করার কারণে 'দাওয়াত ইলাল্লাহ' আন্দোলনে শক্তি পয়দা হয় এবং বিদ'আতের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে উঠে। হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রহ.) ও হযরত ইসমাঈল শহীদ (রহ.) পূর্ববর্তী ও মুরব্বীদের এ মিশনকে আরো অগ্রসর করার চেষ্টা করেন এবং দাওয়াত ও ইসলাহের কাজের পরিধি আরো প্রসারিত করেন। এ সকল মহান মণীষীর কুরবানীর কারণে দ্বীনের কর্মীগণের হিম্মত বুলন্দ হয় এবং তাদের দিল ও দেমাগের উদ্যম বৃদ্ধি পায়। এ ভাবে কুরআন-হাদীসের খিদমতে আত্মনিয়োগকারী এবং দ্বীনি বিষয়ে কলম ধারণকারীদের একটি বিশাল জামাত প্রস্তুত হয়।

এ জামাতের কর্মমুখর হবার কারণে হাদীস শরীফের খিদমতের ক্ষেত্রে দু'টি ধারার মাদ্রাসা সৃষ্টি হয়। প্রথম ধারার মাদরাসা হলো ছাদেকপুরের সালাফী মাদরাসা। এ ধারার প্রাণপুরুষ ছিলেন হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর একজন বিশিষ্ট খলীফা ও আলিমে রব্বানী মাওলানা বেলায়ত আলী আজিমাবাদী (রহ.) এবং দ্বিতীয় মাদরাসার প্রাণপুরুষ ছিলেন মাওলানা নযীর হুসায়ন দেহলভী (রহ.)।

মাওলানা নযীর হুসায়ন দেহলভী (রহ.)-এর দরসে হাদীসে শরীক হয়ে মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাই হাসানী (রহ.)[১] হাদীসের সনদ লাভ করেন। তিনি তার সম্পর্কে লেখেন যে, "আল্লাহ তা'আলা তাকে দীর্ঘ হায়াত প্রদান করেন এবং এর দ্বারা আরব ও অনারবের অসংখ্য লোক উপকৃত হয়। তাকওয়া ও দ্বীনদারী, যুহুদ ও ইল্‌ম ও আমলের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে হাদীসচর্চাকারীদের মাঝে তাঁর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। এ ছাড়া অল্পে তুষ্টি, তাওয়াক্কুল, ইস্তিগনা, হক কথা বলা ও হক বয়ান করা ও ইশকে রসূলের ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহ্‌র একটি নিশানা ছিলেন। তিনি বিদ'আতের কঠিন সমালোচনা করতেন এবং অত্যন্ত বিনয়ী, ধৈর্যশীল, রুচিবান, আত্মমর্যাদাবান ও সৎসাহসী মানুষ ছিলেন।[২]

---

১. মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাই হাসানী (রহ.) লেখক নুযহাতুল খাওয়াতির (১-৮), আস সাকাফাতুল ইসলামিয়া ফিল হিন্দ, ও সাবেক নাজেম, নদওয়াতুল উলামা, মৃত ১৩৪১ হি.

২. নুযহাতুল খাওয়াতির ৭ম খণ্ড।

মাওলানা নযীর হুসায়ন সাহেবের ছাত্রদের মধ্য হতে দু'জনের আলোচনা করা আখলাকী যিম্মাদারী বলে মনে হয়। এ মহান মণিষী দু'জন দু'টি সহীহ গ্রন্থের মুল্যবান ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। একজন হলেন মাওলানা শামসুল হক ডিয়ানুবী (মৃ. ১৩২৯হি)। তিনি আবূ দাঊদ শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ 'গায়াতুল মাকসূদ' রচনা করেন। আর অপরজন হলেন মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (মৃ. ১৩৫৩হি)। তিনি তিরমিযী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ 'তুহফাতুল আহওয়াজী' রচনা করেন।

দ্বীনি দাওয়াত, তরবিয়ত, শিক্ষা ও প্রচার-প্রসারের কয়েকটি গুরুত্ব পূর্ণ প্রতিষ্ঠান

একদিকে যেমন ইসলাহ ও তাজদীদ, দাওয়াত ও তাবলীগের প্রচেষ্টা অব্যহত ছিল, অন্যদিকে শির্ক ও বিদ'আতের উপর লোকজনকে প্ররোচিত-কারীদের দল নিজেদের ময়দানে কর্মতৎপর ছিল। তারা গ্রামে গ্রামে যেত এবং জাহিলিয়াতের শ্লোগান দিত, হককে বাতিল এবং বাতিলকে হক বলে ঘোষণা দিত। হকপন্থী আলিমদেরকে গুমরাহ ও কাফির বলত এবং সত্যনিষ্ঠ মুজাদ্দিদগণকে কাফির বলে ফতওয়া দিত এবং এর বিনিময়ে উপার্জিত আয় দ্বারা নিজেদের পেট ভরতো।

এ অবস্থা দেখে আলেমে রব্বানীগণের দিলে এ দেশে দ্বীনের ভবিষ্যত এবং মুসলিম উম্মাহর সাথে শরীআতের সম্পর্ক ও আগ্রহের ব্যাপারে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হতে লাগল। অন্যদিকে ভারতবর্ষে ইসলামী শাসনের অবসান ও অমুসলিম শাসকদের উত্থান হবার কারণে এ আশংকা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে তাঁরা উপলব্ধি করতে লাগলেন যে, ইসলামী রাষ্ট্রের পতনের পর এখন এমন কোন শক্তি নেই, যা দ্বীন ও শরীআতের পৃষ্ঠপোষকতা করবে এবং মুসলিম উম্মাহর হেফাযত করবে, এমন কোন পদমর্যাদা ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বা কোন মাধ্যম নেই, যা মানুষের দিলে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবে। সুতরাং এখন যদি তাদের কাছে কোন বস্তু থাকে, তাহলে তা হলো দ্বীনের সম্পদ, যদি কোন সম্বল থাকে তাহলে তা হলো ইলমের সম্বল, যদি কোন ভরসা থাকে, তাহলে তা হলো তাওয়াক্কুলের ভরসা, যদি কোন হাতিয়ার থাকে তাহলে তা হলো ইখলাসের হাতিয়ার। সুতরাং তাঁরা দ্বীন ও ইলম, তাওয়াক্কুল ও ইখলাসের উপর ভরসা করে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে, দ্বীনের হিফাযতের জন্য এমন কিল্লা নির্মাণ করবেন, যেখানে দ্বীন সুরক্ষিত হবে এবং শরীআত আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে।

দারুল উলূম দেওবন্দ ও মাজাহেরুল উলূম সাহারনপুর এ দ্বয়ের দ্বীনী অবদান

দ্বীনী ইলমের স্থায়িত্বের এবং শরীআতের হিফাযতের জন্য আলিমদের সামনে একটিমাত্র পথ অবশিষ্ট ছিল। আর তা হলো দ্বীনী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা এবং ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে, অলি-গলিতে মক্তবের জাল বিছিয়ে দেয়া। কাজেই তাঁরা ইসলামী ঐতিহ্যের হিফাযত এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির আগ্রাসন ও তুফানকে প্রতিরোধ করার জন্য এবং আলিম, দ্বীনদার ও ওয়ায-নসীহতকারীদের একটি জামাত প্রস্তুত করার লক্ষ্যে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলন শুরু করেন। কারণ, পরবর্তিতে এ সকল লোকই ইসলামের হারানো বিশ্বাস পুণর্বহাল করা, ইসলামী ঐতিহ্য ও ইসলাম হিফাযতের মিশনকে অগ্রসর করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন।

১২৮৩ হিজরীতে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী (রহ.) এ প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করেন এবং এর নেতৃত্ব প্রদান করেন। এ বছরেই শায়খ সায়াদত আলী (রহ.) সাহারানপুরে মাজাহিরুল উলূম প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরেই ভারতবর্ষে মাদরাসার জাল বিস্তার লাভ করে। ভারতবর্ষের প্রতিটি এলাকা এখন বিভিন্ন ধরনের মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। আর এটি একটি সর্বজন স্বীকৃত বিষয় যে, দ্বীনী ইলম সর্বস্তরে প্রসারিত করার ক্ষেত্রে, ইসলামী ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে, শির্ক-বিদ'আতের শক্তিকে দূর্বল করতে এবং মুসলিম উম্মাহর মাঝে দ্বীনী চেতনা সৃষ্টি করতে, দিলের মাঝে মুজাহাদা ও কুরবানীর জযবা সৃষ্টি করতে এ সকল মাদরাসা বিরাট ভূমিকা পালন করে আসছে।

এ সকল মাদরাসা হতে বের হওয়া আলেমগণ শুধু যে আক্বীদার ইসলাহ করেছেন এবং বিদ'আতপন্থী ও গুমরাহ লোকদের সাথে তর্ক ও মুনাযারা করে তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে বাধ্য করেছেন এমন নয়; বরং তাঁরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা দেশের প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং জালিম ও স্বৈরাচার শাসকদের সামনে হক কথা বলার সৎসাহস প্রদর্শন করেন।

দারুল উলূম দেওবন্দ কিছু পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের সাথে দরসে নিযামীকে গ্রহণ করে। দরসে নিযামী মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা নিযাম উদ্দীন আনসারী ফিরিঙ্গি মহল্লী (রহ.) (মৃ. ১১৬১ হি.) এ মাদরাসাতে যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, উসূলে ফিকহ, ও আকাইদ বিশেষভাবে পাঠ দান করা হত। এরপরেও যে ইলমের প্রতি

দারুল উলূম দেওবন্দ সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে, তা ছিল ইলমে হাদীস। হাদীসশাস্ত্রকে প্রচার ও প্রসার করার ক্ষেত্রে এবং পূর্ণ আদব ও তাহকীকের সাথে এর তুলনামূলক অধ্যয়ন করা, তা দ্বারা ফিকহী মাসয়ালার ক্ষেত্রে দলীল হিসেবে পেশ করা এবং ফিকহে হানাফী (রহ.)-কে হাদীসের আলোতে গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

আল্লামা শায়িখ মুহাম্মদ আবদুহ-এর বিশিষ্ট শাগরিদ এবং তৎকালীন সময়ের বিখ্যাত বক্তা ও আলিম আল্লামা সাইয়িদ রশীদ রিযামিসরী তাঁর আল-মানার পত্রিকাতে ইলমে হাদীসের ক্ষেত্রে দারুল উলূম দেওবন্দের অবদান এবং প্রতিষ্ঠানটির উস্তাদগণের দক্ষতার স্বীকৃতি প্রদান করেন। তিনি নদওয়াতুল উলামার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের দাওয়াতে নদওয়ার বাৎসরিক মাহফিলে সভাপতিত্ব করার জন্য ১৩৩০ হিজরি, মুতাবিক ১৯১২ সালে লাক্ষ্ণৌ তাশরীফ আনেন। ভারতের এ সফরে তিনি যখন দারুল উলূম দেওবন্দ আগমন করেন এবং সেখানকার হৃদয়গ্রাহী পরিবেশ দেখেন, তখন অনিচ্ছায় তার মুখ থেকে বের হয়, "যদি আমি এ প্রতিষ্ঠান না দেখে যেতাম তাহলে আমি ভারত থেকে ব্যর্থ ও বিফল হয়ে ফিরে যেতাম।" অতঃপর যখন দারুল উলূমের শায়খুল হাদীস আল্লামা আনওয়ারশাহ কাশ্মিরী (রহ.)-এর দরসে হাদীসে অংশ নেন, তখন তিনি এ কথার স্বীকৃতি প্রদান না করে থাকতে পারেনি যে, এ ধরনের সুযোগ্য আলিম আমি ইতিপূর্বে আর কখনো দেখিনি।' তিনি 'মিফতাহুল কুনূযুস সুন্নাহ'-এর ভূমিকায় লেখেন, যদি ভারতবর্ষের আলিমগণ এ যুগে ইলমে হাদীসকে ধারণ না করতেন এবং এটাকে জীবনের মিশন হিসেবে গ্রহণ না করতেন, তাহলে এ ইলম প্রাচ্য হতে বিলীন হয়ে যেত। মিশর, সিরিয়া, ইরাক ও হেজায থেকে হিজরি দশম শতাব্দি থেকে এ এলেম পতনের শিকার হয় এবং হিজরী চৌদ্দ শতাব্দিতে তা পতনের শেষ স্তরে পৌছে যায়।'

মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী (রহ.)

আলেমে রব্বানী মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম সিদ্দীকী নানুতুবী (রহ.) ১২৪৮ হিজরীতে নানুতা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাহ আব্দুল গনী ইবন শাহ আবূ সাঈদ দেহলভী হতে হাদীস শিক্ষা করেন এবং সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত তার সাহচর্য ও প্রশিক্ষণ হতে উপকৃত হতে থাকেন। আত্মসংযম ও আল্লাহ ভীতি, যিকির ও মুরাকাবার ক্ষেত্রে তিনি সমকালীন ব্যক্তিদের মাঝে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। ১২৭৩ হিজরী মুতাবিক ১৮৫৭ সালের বিপ্লবে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ অপরাধে তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী ঘোষণা করা হয়। ফলে, তিনি কয়েকদিন আত্মগোপন করে থাকেন। এরপরে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তি স্থাপন করেন। ফলে, তাঁর খ্যাতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। তিনি খ্রিস্টান, পাদ্রী ও হিন্দুদের সাথে বাহাস-বিতর্ক করেন এবং বারংবার তাদেরকে পরাজিত করেন। তিনি আক্বীদা, দ্বীনী বিষয় ও ইলমে কালাম বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। এ সকল গ্রন্থে তিনি ইসলামের সূক্ষ্ম বিষয় ও রহস্য নিয়ে আলোচনা করেন। ভারতবর্ষে যারা প্রাচীন ভাবধারায় ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন শীর্ষ স্থানের অধিকারী। তিনি ১২৯৭ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)

মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) সম্পর্কে এখানে এতটুকু আলোচনা করাই যথেষ্ট মনে করছি, যা ভারতীয় আলিমদের পরিচিতিমূলক বিখ্যাত গ্রন্থ 'নুযহাতুল খাওয়াতের'-এ লেখা হয়েছে। কারণ, এটি একটি ইনসাফপূর্ণ ও বাস্তবতানির্ভর অনন্য জীবনী গ্রন্থ।

"শরীআতের উপর আমল, সুন্নাতের অনুসরণ এবং সূলুক ও তরীকতের ক্ষেত্রে তিনি অতি উঁচু মর্যাদার অধিকারী এবং অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের ধারক ছিলেন। বিদ'আতের বিরুদ্ধাচারণ এবং ইসলামী রীতিনীতির সম্মান ও সুন্নাতের প্রচার-প্রসার, ইসলামী বিধি-নিষেধ ও হুকুম আহকামের উপর আযীমত ও দৃঢ়তার সাথে আমল করার ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহ্‌র একটি অনন্য নিদর্শন ছিলেন। হকের ব্যাপারে তিনি কারো পরওয়া করতেন না। অনৈসলামী বস্তু দেখার পর কখনো তিনি নীরব থাকতেন না, দ্বীনের মধ্যে সামান্য পরিবর্তনও কখনো বরদাশত করতেন না এবং শরীআতের ব্যাপারে কখনো তিনি নীরবতা পছন্দ করতেন না।

বিনয় তাঁর স্বভাব, হক তার আলামত এবং কোমলতা তাঁর বিশেষত্ব ছিল। সঠিক বিষয় বুঝে আসার পর নিজের মতামত পরিহার করার ক্ষেত্রে তিনি লজ্জাবোধ করতেন না। ইলম-আমল, প্রশিক্ষণ আত্মার পরিশুদ্ধি সুন্নাত জীবিত-করণ, দাওয়াতের ময়দানে এবং বিদ'আতের মূলোৎপাটনের ক্ষেত্রে সব সময় অগ্রগামী ও ইমামের ভূমিকা পালন করেন। ৯ই জুমাদিউস সানী ১৩২৩ হিজরীতে তিনি ইন্‌তেকাল করেন।"[১]

---

১. নুযহাতুল খাওয়াতির ৮ম খণ্ড। বর্তমানে গ্রন্থটি দারে আরাফাত রায়বেরেলী হতে 'আল-ইলাম বিমান ফী তারিখিল আ'লাম' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)

দারুল উলূম দেওবন্দের পৃষ্ঠপোষক ও তার সাথে সম্পৃক্ত আলিমগণের মধ্যে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে এখানে নুযহাতুল খাওয়াতির হতে একটি উদ্ধৃতি পেশ করা হলো :

"হযরত থানভী (রহ.) ভারতের বিখ্যাত আলিম ও একজন বড় ধরণের সংস্কারক ছিলেন। তালিম-তরবিয়ত, ইরশাদ ও তাওয়াজ্জুহ এবং তাযকিয়ায়ে নফস ও ইসলাহে হালের ক্ষেত্রে তিনি সর্বজনের প্রাণকেন্দ্র ছিলেন। মানুষ তাদের সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে হাযির হতো এবং তাঁর ইলম ও ইরফানের ঝর্ণাধারা হতে পিপাসা নিবারণ করে ফিরে যেত। দিলের রোগ এবং বাতেনী ব্যাধি নিয়ে তাঁর দরবারে হাযির হতো এবং তাঁর বিজ্ঞ ও হাকীমানা দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে সুস্থ হয়ে ঘরে প্রত্যাবর্তন করত। হাজার হাজার মানুষ তাঁর ওয়ায ও নসীহত, মজলিস ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে সুন্নাতের অনুসারী ও শরীআতের উপর আমলকারীতে পরিণত হয়েছে এবং জাহিলী রসম ও রেওয়াজ এবং শির্কী আক্বীদা-বিশ্বাস ও অনৈসলামী রসম-রেওয়ায হতে নাজাত পেয়েছে। বস্তুত এ সকল রীতিনীতি হিন্দুদের সাথে সুদীর্ঘ সংস্পর্শের কারণে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছিল এবং দুঃখ ও আনন্দের মুহূর্তে তা পরিলক্ষিত হতো।

হযরত থানভী (রহ.) তাসাউফ ও তরীকতকে অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় পেশ করেন, বাস্তব জীবনে তা বাস্তবায়ন করেন এবং মাকসাদ ও উপকরণের মাঝে পার্থক্য নির্ধারণ করেন। হযরত থানভী (রহ)-এর ছোট-বড় গ্রন্থ ও পুস্তিকার সংখ্যা আটশতের অধিক হবে। হযরত থানভী (রহ.) ১৬ই রজব ১৩৬২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।"[১]

---

১. সংক্ষিপ্ত নুযহাতুল খাওয়াতির ৮ম খণ্ড

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সংগ্রামের মহান নায়ক শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (রহ.)

দারুল উলূম দেওবন্দের সদরুল মুদাররিস হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (রহ.) পরবর্তিতে শায়খুল হিন্দ নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে একটি স্বাধীন, ইনসাফভিত্তিক ও সাংবিধানিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কুরবানী ও আত্মত্যাগের ময়দানে অগ্রগামী ছিলেন। সুলতান টিপু ব্যতীত ইংরেজ দুশমনির ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব প্রদানকারী ও খিলাফতের পতাকাবাহী খিলাফতে উসমানী সরকারের পূর্ণ সমর্থনকারী ও সহযোগী ছিলেন। তিনি তৎকালীন আফগান সরকার ও খিলাফতে উসমানীয়ার সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা করেন। এ উদ্দশ্যে তিনি মদীনা শরীফ গেলে ১২১৬ হিজরিতে মদীনার শাসক শরীফ হুসাইন তাঁকে গ্রেফতার করে ইংরেজ সরকারের হাতে তুলে দেয়। ১৯১৭ সালে ইংরেজ সরকার তাঁকে ও তাঁর সহযোগীদের মধ্য হতে মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী, হাকিম নুসরত হুসাইন, মৌলভী সৈয়দ ওয়াহিদ আহমদ সহ অসংখ্য নেতা কর্মীকে মাল্টার দ্বীপে দেশান্তর করে। এ সকল মহান মনীষী ১৯২০ সাল পর্যন্ত মাল্টার দ্বীপে নির্বাসিত জীবন যাপন করেন। জমিয়াতুল উলামা-এর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আব্দুল বারী ফিরিঙ্গি মহল্লী এ ধরণের জাতীয় সমস্যার পূর্ণ সমর্থক এবং খিলাফত আন্দোলনের সংগ্রামী নেতা ছিলেন।

এ বিপ্লব ও স্বাধীনতা সংগ্রামে জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে। এতে হিন্দু-মুসলিম সর্বস্তরের জনতা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভারতের ইতিহাসে এমন জোরাল সংগ্রাম, এমন উদ্দীপনা, এমন জাতিয় ঐক্য, জনসাধারণের এমন জোড়ালো সমর্থন এবং হিন্দু-মসলিম উভয়ের মাঝে এমন একতা ও সম্মিলিত প্রয়াস আর কখনো পরিলক্ষিত হয়নি। এ ক্ষেত্রে তখনো মুসলমানগণই নেতৃত্ব প্রদান করছিল এবং ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে এক কাতারে আনতে এবং এ সংগ্রাম আরো সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সুমহান ভূমিকা পালন করেন।[১]

---

১. হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর বিস্তারিত জীবনী পাঠের জন্য দেখুন 'নুজহাতুল খাওয়াতির ৮খ, বা আসিরে মাল্টা, সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানী (রা) কর্তৃক প্রণীত।

বিশিষ্ট ইংরেজ লেখক মি. উলিয়ম হান্টার 'দ্যা ইনডিয়ান মুসলমান ' নামক তার বিখ্যাত গ্রন্থে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আলোচনা করে লিখেন যে, "জিহাদের যে আগুন সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.) প্রজ্জ্বলিত করেন, ঐ আগুনই স্বাধীনতা সংগ্রামে মূল ভূমিকা পালন করে। এ যুদ্ধের নেতৃত্ব প্রদানকারী আলিম ও পীর বূযর্গদের মধ্যে মাওলানা আহমদুল্লাহ, মাওলানা লিয়াকত আলী, জেনারেল নজীব খান, হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কি, মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী, মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, হাফেয যামেন শহীদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ সকল মহান মণীষী ছাড়াও স্বাধীনতা সংগ্রামে ও বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী উলামা ও শায়খগণের এক বিশাল বড় ফিরিস্তি রয়েছে।

সাইয়িদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)

মুছলিহে উম্মত ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মাওলানা সাইয়িদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) ইবন সৈয়দ হাবিবুল্লাহ (রহ.) ১৯শে শাবান ১২৯৬ হিজরিতে উন্নাউ শহরের নিকটে বাঙ্গারমাউ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন 'টান্ডা' এলাকাতে। অতঃপর দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন। সেখানে তিনি সাত বছর অবস্থান করে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি হাদীস পাঠ করেন শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (রহ.)-এর নিকট এবং সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর সোহবতে থেকে ফায়েয হাসিল করেন। অতঃপর মদীনা শরীফ গমন করেন। সেখানে তিনি সিদক ও ইখলাস, তাওয়াক্কুল ও কেনাআত, যুহুদ ও মুজাহাদার সাথে কয়েক বছর অবস্থান করেন। এরপর তিনি আবার ভারতে ফিরে আসেন। পরে আবার তিনি ১৩২০ সালে মদীনা শরীফে গমন করেন।

মদীনা শরীফে তিনি স্বেচ্ছায় হাদীসের দরস প্রদান করতেন। এর পাশাপাশি তিনি তাফসীর ও ফিকহ-এর দরসও দিতেন। ১৯১৭ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত তিন বছর তিনি মাল্টার দ্বীপে দেশান্তর থাকেন এবং ধৈর্য ও সবরের একটি উত্তম উদাহরণ পেশ করেন।

আল্লামা আনওয়ারশাহ কাশমিরী (রহ.) যখন দারুল উলূম দেওবন্দ ত্যাগ করে ডাবিল গমন করেন তখন তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের সদরুল মুদাররিস (প্রধান শিক্ষক) হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং শায়খুল হাদীসের জন্য তাঁকে নির্বাচন করা হয়। তাদরিসের পাশাপাশি তিনি সদরুল মাদাররিসের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের সুনাম-সুখ্যাতি ও নেতৃত্ব অক্ষুন্ন রাখেন এবং তা আরো বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। তাঁর কারণে এ প্রতিষ্ঠানের প্রতি মুসলমানদের আস্থা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি হাদীসের শিক্ষা, জিহাদের জন্য প্রস্তুতি, কুরবানীর জযবা সৃষ্টি করতে এবং ইসলামী চেতনাবোধ জাগ্রত করতে ও মুসলমানদের মাঝে ঈমানী শক্তি সৃষ্ট করার ক্ষেত্রে মূল্যবান ভূমিকা পালন করেন। তিনি নিজের ইচ্ছাশক্তি, বুলন্দ হিম্মত ও সুদৃঢ় সংকল্পের সাথে শিক্ষকতা ও রাজনীতি উভয় ময়দানে কর্মতৎপর ছিলেন।

৮ই জামাদিউস-ছানী ১৩৬১ হিজরিতে তাঁকে ইংরেজ সরকার গ্রেফতার করে জেলে পাঠায়। জেলে তাঁকে বিভিন্ন প্রকার কঠোর শাস্তি প্রদান করা হতো কিন্তু তিনি সেসব কিছু ধৈর্য সহকারে ছওয়াবের আশায় হাসিমুখে বরণ করেন।

জেলে তিনি বন্দীদের মাঝে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতেন। বাকি সময় যিকির-আযকার ও বিভিন্ন ওযীফা পাঠ করে সময় কাটাতেন। এভাবেই একদিন তাঁকে মুক্তি প্রদান করা হলো। জেলখানা হতে বের হবার পর পুনরায় তিনি দরস ও তাদরীস, ইরশাদ ও তাওজীহ এবং জিহাদ ও মুজাহাদাময় জীবন শুরু করেন।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন ও বিভক্ত হয় এবং দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ফাসাদের আগুন জ্বলতে থাকে এবং সে আগুনে দেশের শহর ও গ্রাম, অলী গলি সব জ্বলতে থাকে, রক্তের বন্যা প্রবাহিত হতে থাকে, দ্বীনী মাদরাসা ও মক্তবসমূহ বিপদে ও অস্তিত্বসংকটে পড়ে এবং এ বিপদ থেকে মুক্তির কোন পথ নজরে পড়ছিল না, তখন হযরত মাদানী (রহ.) মুসলিম জনসাধারণের হিম্মত ও সাহস বুলন্দ রাখতে এবং সবর ও অটুট মনোবল ধারণ করার জন্য জনসম্মুখে আসেন। তিনি ওয়ায ও নসীহতের দ্বারা মুসলমানদের দ্বীনী যিম্মাদারীর বিষয়ে সজাগ থাকার জন্য প্রেরণা দিতে থাকেন।

হযরত মাদানী (রহ.)-এর ওয়ায- নসীহতের দ্বারা মুসলমান জনসাধারণের দিলে ঈমানী চেতনা জাগ্রত হয়, আল্লাহ্‌র কুদরতের উপর ইয়াকীন বহাল হয়, দ্বীন নিয়ে ফখর করার জযবা সৃষ্টি হয়, নড়বড়ে পাগুলো অটল ও অবিচল হয়, যাদের দিলে ভয় ও হতাশা ছিল, তা দূর হয়ে যায়। দ্বীনী মাদরাসা ও মক্তবসমূহে নতুন জীবন ফিরে আসে এবং মুসলমানগণ এ দেশে পূর্ণ আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে দ্বীনী দাওয়াত ও দ্বীনী কাজ করার জযবা ফিরে পায়।

হযরত মাওলানা সাইয়িদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) দেশ স্বাধীনের পর রাজনীতি হতে দূরে সরে আসেন এবং তালিম ও তাদরীস, দাওয়াত ও তাবলীগ, তরবিয়ত ও তাযকিয়াতুন্নাফসকে নিজের জীবনের মিশন হিসেবে গ্রহণ করেন। সরকার ও সরকারি আমলাদের সাথে তিনি কোন প্রকার ঘনিষ্ঠতা রাখেননি এবং রাষ্ট্রপতির পক্ষ হতে প্রদত্ত সম্মাননা গ্রহণ করা হতে তিনি বিরত থাকেন। তিনি হাদীসের দরস দিতেন এবং সারা দেশে সফর করতেন। সবখানে তিনি জনসাধারণকে দ্বীনকে মজবুতির সাথে আঁকড়ে ধরতে, সুন্নাতের অনুসরণ করতে,

শরীআতের অনুশাসন মেনে চলতে এবং নিজেদের জন্য সাহাবায়ে কিরামের জীবন ও আদর্শকে গ্রহণ করার প্রতি অনুপ্রাণিত করতেন। ১৩ই জামাদিউল উলা ১৩৭৭ হিজরি মুতাবিক ১৯৫৭ সালে তিনি ইন্‌তেকাল করেন। তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর উপর সুন্নাতের ও দ্বীনী গায়রতের প্রচণ্ড জযবা ছিল। ফলে, তিনি সামান্য সুন্নাতের বিরোধিতা ও দ্বীনী বিষয়ে অবহেলা বরদাশত করতে পারতেন না। তিনি ইসলামী ঐতিহ্যের অবমূল্যায়ন ও অবমাননাকে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করতেন।

মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.)

ভারতবর্ষের বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস এবং বিশিষ্ট আলিমগণের মধ্যে মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১২৯৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন তাঁর মামা মাওলানা মামলূক আলী ও শায়খ মাজহার নানুতুবী এবং দারুল উলূম দেওবন্দ ও মাজাহিরুল উলূম সাহারানপুরের অন্যান্য বিশিষ্ট আলিমগণের নিকট। ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য তিনি লাহোর সফর করেন। সেখানে তিনি বিশিষ্ট সাহিত্যিক মাওলানা ফয়জুর রহমান সাহারানপুরীর অনুগত ছাত্র হিসেবে সাহিত্য চর্চা করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি মাজাহিরুল উলূম সাহারানপুরে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৩০৮ সালে তাঁকে দারুল উলূম দেওবন্দে উস্তাদ হিসেবে নির্বাচন করা হয়। এখানে তিনি ছয় বছর দরস প্রদান করেন। ১৩১৪ হিজরিতে তিনি মাজাহিরুল উলূমে ফিরে যান এবং প্রধান মুদাররিসের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ত্রিশ বছরের অধিক সময় তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। ১৩২৫ হিজরীতে তাঁকে সাহারানপুরের মুহতামিম হিসেবে নির্বাচন করা হয়। তখন তিনি এর প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় গোটা ভারতবর্ষে এ প্রতিষ্ঠানের সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ফলে, দূরদুরান্ত হতে এখানে লেখাপড়া করার জন্য ছাত্র আসা শুরু হয়। ১৩৪২ হিজরিতে তিনি ভারত থেকে হিজরত করে হারামাইন শরীফাইন রওয়ানা হয়ে যান এবং ওফাত পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।

তিনি হাদীস শরীফের ইলম অত্যন্ত দক্ষতা ও গবেষণামূলকভাবে হাসিল করেন। তিনি হাদীস পাঠ করেন মাওলানা মাজহার নানুতুবী, মাওলানা আব্দুল কাইউম বুরহানুবী, সিরিয়ার মুফতি শায়খ আহমদ দেয়লান, শাহ আব্দুল গনী ইবন আবূ সাঈদ মুজাদ্দিদী এবং সৈয়দ আহমদ বরযখী প্রমুখ বড় বড় মুহাদ্দিসের নিকট। হাদীসের দরস ও তাদরীস, মুতালাআ ও তাহকীক এবং এ বিষয়ে কিতাব রচনা করার প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

তাঁর বড় তামান্না ছিল যে, তিনি আবূ দাঊদ শরীফের শরাহ লিখবেন। সুতরাং তিনি ১৩২০ হিজরিতে এ পবিত্র কাজ শুরু করেন। তাঁর প্রিয় ছাত্র

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) এ পবিত্র কাজে সহযোগিতা করতেন। মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.)-এর পূর্ণ মনোযোগ ছিল এর দলীল ও উৎস জমা করা এবং এগুলোকে যাচাই বাছাই করা ও লেখানোর প্রতি। এ ছাড়া অন্য কাজের প্রতি তাঁর খেয়াল আসত না এবং এছাড়া অন্য কিছুতে তাঁর মজা ও তৃপ্তিও আসত না। ১৩৪৪ হিজরীতে তিনি হিজাযে মুকাদ্দাস পৌঁছেন এবং ওফাতের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এ মুবারক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৩৪৪ হিজরির ১৫ই মুহাররম তিনি মদীনা শরিফে পৌঁছেন এবং তখন থেকেই কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েন। ১৩৪৫ হিজরি সনের শাবান মাসে এ মুবারক কাজ সমাপ্ত করেন। আবূ দাঊদ শরীফের এ শরাহ গ্রন্থটি বড় বড় পাঁচখন্ডে সমাপ্ত হয় এবং 'বজলুল মাজহুদ ফী সুনানি আবূ দাঊদ' নামে প্রকাশিত হয়। হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণ এ শরাহ গ্রন্থকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং ইলমী ও তাহকীকী কর্মে তা দ্বারা উপকৃত হন। মুলত এ কিতাবটি তাঁর ইলম ও গবেষণার সারসংক্ষেপ ও তাঁর রুচি ও শওকের প্রতিচ্ছবি। এ কিতাব রচনা করার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম ও মরণপণ মেহনত করেন এবং ইলমী গবেষণার যাবতীয় কষ্ট-ক্লেশ বরদাশত করেন। এ কিতাব সমাপ্তির পর ইবাদত-বন্দেগী, তিলাওয়াত ও যিকির-আযকার এবং মুরাকাবায় মশগুল থাকতেন। আর এভাবেই তিনি আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দেন।

মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আযকার, গবেষণা ও অধ্যয়ন এবং গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের ক্ষেত্রে নিজের সামর্থের ঊর্ধ্বে বোঝা চাপিয়ে নেন। আর এ কারণে তাঁর শারীরিক দূর্বলতা ও অক্ষমতা সব সময় লেগে থাকত। আল্লাহ তা'আলা তার মাধ্যমে বিরাট এক জামাতকে উপকৃত করেন। তাঁর মেহনত ও তরবিয়তের কারণে আলিম-উলামা, পীর-মাশায়েখ ও সংস্কারকদের একটি বিশাল জামাত প্রস্তুত হয়। এ সকল মহান মণীষির প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে দ্বীনী ইলমের প্রচার প্রসার, আক্বীদার ইসলাহ ও সমাজ সংস্কারের এবং দাওয়াত ও তাবলীগের বিরাট খিদমত হয়।

এ মহান মনিষীগণের মধ্যে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস কান্ধলভী (রহ.), প্রবর্তক তাবলীগী জামাত ও ভারতের মহান সংস্কারক এবং শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকরিয়া (রহ.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) অত্যন্ত তীক্ষ্ণ অনুভূতি ও সূক্ষ্ম উপলব্ধি ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। নরম স্বরে এবং স্পষ্ট করে কথা বলতেন। সুন্নাতের অনুসরণ ও বিদ'আতের কঠিন বিরোধিতাকারী ছিলেন। মেহমানদের

সম্মান করতেন এবং সাথীদের সাথে নরম ব্যবহার করতেন। স্বাধীন মেজাযের অধিকারী এবং সময়মত কাজ করা পছন্দ করতেন। মানুষকে উপকার করার জন্য সব সময় সচেষ্ট থাকতেন এবং সবসময় তাঁর উপর আখিরাতের ফিকির গালেব থাকত। দ্বীনী বিষয়ে সব সময় নিজের মুহাসাবা করতেন ও রাজনীতি থেকে সবসময় দূরে থাকতেন। কিন্তু মুসলমানদের বিষয়ে কখনো অলসতা প্রদর্শন করতেন না। তিনি দ্বীনী আত্মমর্যাদাবোধ ও হামিয়তের জীবন্ত নমুনা ছিলেন। তিনি সাতবার হজ্জ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৩৪২ হিজরীতে তিনি সর্বশেষ হজ্জ করেন এবং ১৬ই রবিউল আওয়াল ১৩৪৬ হিজরীতে তিনি মদীনা শরীফে মহান আল্লাহ্ পাকের চির সান্নিধ্যে চলে যান।

তাঁর জানাযা নামাযে বিশাল বড় জামাত হয়। তাঁর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের অনেকে তাঁর ব্যাপারে ভাল স্বপ্ন দেখেন। প্রিয় নবী (সা.)-এর পরিবারের সদস্যগণের কবরের পাশে তাঁকে চির নিদ্রায় শায়িত করা হয়।

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলভী (রহ.)

মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.)-এর সর্বাধিক যোগ্য ও বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন মাজাহিরুল উলূম মাদরাসার শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া (রহ.)। তিনি একজন সর্বজন সমাদৃত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সারা জীবন হাদীসের তালিম, হাদীস গ্রন্থসমূহের তাহকীক ও তাশরীহ এবং মুহাক্কিক ও ব্যাখ্যাকারীদের মতামতকে বিচার-বিশ্লেষণ করার মাঝে কাটিয়েছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিজেই একটি স্বতন্ত্র কর্মতৎপর একাডেমী ছিলেন। তাঁর জীবনের কোন একটি মুহূর্তও দ্বীনী খিদমত ছাড়া অতিবাহিত হয়নি। তাঁর মন হাদীসের দরস ছাড়া অন্য কোন কর্মে তৃপ্তি পেতনা এবং লেখালেখি ছাড়া অন্য কিছুতে আনন্দ লাভ করত না। হাদীসের যে সকল গ্রন্থ তিনি রচনা করেন এবং যা সর্বজন সমাদৃত হয়েছে ও মুহাদ্দিসগণ তা হতে গবেষণার কাজে সহযোগিতা গ্রহণ করেন, এগুলোর তার নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. আওজাযুল মাসালিক;
২. হাজ্জাতুল বিদা' ওয়া 'উমরাতুন নাবী (সা.);
৩. আল-খিসালুন নাবাবিয়্যা;
৪. লামে'উদ-দুরারী ফী তাকরিরাতিল বুখারী;
৫. আল-আবওয়াবু ওয়াতারাজিম লিল-বুখারী।

তিনি ১লা শাবান ১৪০১ হিজরী মুতাবিক ২৪শে মে মদীনা শরীফে ইন্তেকাল করেন এবং তাঁকে জান্নাতুল বাকিতে সমাধিত করা হয়।

১. এখানে হযরত শায়খুল হাদীস সাহেব (রহ.)-এর শুধু আরবী কিতাবের নামগুলো উল্লেখ করা হলো। এছাড়া উর্দূতে যা রচনা করেন সেগুলোর মধ্যে ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে সদাকাত ও শামায়েলে তিরমিযী এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিদ'আতী দল ও কাফির ফতওয়া প্রদানকারীদের মুল নিশানা

আকাবিরে দেওবন্দ প্রথম থেকেই বেরেলভী পন্থীদের কুফুরী ও গোমরাহ ফাতওয়া প্রদানের নিশানায় পরিণত হন। আকাবিরে দেওবন্দ ও তাদের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরকে বেরেলভী পন্থীরা ওহাবী বলে ডাকত। নিজেদের মসজিদে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। আর কেউ যদি কখনো ভুল করে তাদের মসজিদে

প্রবেশ করত, তাহলে তারা তাকে বের করেই প্রশান্তি লাভ করত। তাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া অপরাধ মনে করা হতো এবং পারিবারিকভাবেও তাদের সাথে সম্পর্ক না রাখার জন্য আহবান জানাত। বরং তারা তাদের পরিপূর্ণরূপে সামাজিকভাবে বয়কট করার আন্দোলন করত।

দেওবন্দী মাদরাসাসমূহের সফলতার রহস্য

দ্বীনী ইলম জনসাধারণের কাছে পৌছে দেয়া, দ্বীনী পরিবেশ সৃষ্টি করা, দ্বীনী চেতনা বিরাজ করা এবং দিলে ইসলামী অনুভূতি জাগ্রত করার ক্ষেত্রে দারুল উলূম দেওবন্দ ও মাজাহিরুল উলূম সাহারানপুর অন্যান্য মাদরাসার তুলনায় বিস্ময়কর সফলতা অর্জন করে। মূলত, এ সফলতার পিছনে রহস্য হলো, তারা কখনোই সরকারের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করে নি; বরং সহজ সরল জীবন যাপন, অল্পেতুষ্টি, ত্যাগ ও কুরবানী, যুহুদ ও মুজাহাদার মজবুত ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর নিজেদের প্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং এর উপর অটল অবিচল থাকেন। বস্তুত এটি এমন এক বুনিয়াদ যা তাঁদের মাঝে কর্মশক্তি সঞ্চয় করেছে এবং বাতিলকে মুকাবিলা করার যোগ্যতা সৃষ্টি করেছে। এর পাশাপাশি এ সকল মাদরাসা থেকে ফারেগ আলিমগণ সরকারি চাকুরি করা এবং অধিক বেতনে চাকরি করার মানসিকতা হতে নিজেদেরকে বিরত রেখেছেন। কারণ, তাঁরা এমন মাদরাসার সনদপ্রাপ্ত ছিলেন যা সরকারিভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ছিল না। ফলে, এ সকল আলিম সরকারি চাকুরি হতে বিমুখ হয়ে এবং অধিক বেতনের লোভ পরিহার করে দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগ এবং সর্বসাধারণের ইসলাহ ও তরবিয়তের ফিকিরে আত্মনিয়োগ করেন এবং এটাকেই কর্মক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। এভাবে দ্বীনের এমন কিছু দায়ী দাওয়াতের ময়দানে পরিলক্ষিত হয় যারা দাওয়াতকে জীবনের মিশন হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকেই চরম পাওয়া বলে মনে করতেন এবং আখিরাতের সফলতাই তাঁদের কাছে ছিল আসল সফলতা। এ সকল উলামায়ে কিরাম আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় দ্বীনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং অল্পে তুষ্ট হয়ে জীবন যাপন করতেন। তারা দাওয়াত ও তাবলীগ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে কখনো মনোনিবেশ করে নি। তাঁরা সবসময় সাধারণ জনগণের সাথে মিশে থাকতেন। মাদরাসা ও মসজিদই ছিল তাঁদের মিশনের প্রাণকেন্দ্র। তাঁরা তাঁদের ইখলাসের বরকতে এবং কুরবানীর শক্তিতে ও ইসলামী জযবার ক্ষমতায় এমন ইসলাহী কর্ম সম্পাদন করেন যা বড়বড় প্রতিষ্ঠান ও বড়বড় রাষ্ট্রের পক্ষে করা সম্ভব নয়। যদি কোন রাষ্ট্র তার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও যাবতীয় উপকরণ ব্যবহার করে, তথাপিও এমন মহান খিদমত আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়।

নাদওয়াতুল উলামা

যখন উলামায়ে কিরাম উপলব্ধি করলেন যে, বর্তমানে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণীর মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, মাদরাসা থেকে পাশ করা শিক্ষার্থী ও স্কুল-কলেজ থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীর মাঝে অপরিচিতির সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মিত হচ্ছে, উভয় পক্ষ শুধু যে পরস্পরের সাথে অপরিচিতের ন্যায় আচরণ করছে তাই নয়, বরং একে অন্যের সাথে দুশমনী মনোভাব পোষণ করে, একই দেশে বসবাস করার পরেও পরস্পরের ভাষা ভিন্ন, সভ্যতা ভিন্ন এবং পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গিও ভিন্ন। এদেরকে দেখে মনে হয় যেন একদল যমীনের বাসিন্দা আর অন্যদল আসমানের বাসিন্দা।

যখন উলামায়ে কিরাম অনুভব করতে লাগলেন যে, এ যুগে যদি ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগের কাজকে ত্বরান্বিত করতে হয় এবং এ কাজকে আরো অধিক গ্রহণযোগ্য বানাতে হয়, তাহলে এ জন্য প্রয়োজন এমন কর্মপন্থা অবলম্বন করা, যা যুগের মেজায ও এ সমাজে বসবাসরত মানুষের মানসিকতার অধিক নিকটবর্তী হয় এবং এ আন্দোলনের সাথে জড়িত উলামায়ে কিরামকে বর্তমান যুগে প্রচলিত ও স্বীকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতাগণ এবং বিশেষ করে এ আন্দোলনের অগ্রপথিক মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী (রহ.) ১৩১৬ হিজরিতে লাক্ষ্ণৌতে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদরাসার বুনিয়াদী মাকসাদ ছিল– প্রাচীন উপকারী বস্তু ও আধুনিক কল্যাণকর বস্তুর মাঝে শক্তিশালী সমন্বয় সাধন করা, আক্বীদা, তাওহীদের মজবুতি সৃষ্টি করা এবং দ্বীনের উসূল ও মূলনীতিকে ঠিক রেখে শাখাগত ও ইখতেলাফী মাসয়ালার ব্যাপারে উদারতা অবলম্বন করা। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে এমন আলিম ও লেখক সৃষ্টি হয়, যারা প্রাচীন ও আধুনিক উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত এবং দু'টি ভিন্ন মতাদর্শের লোকজনের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম। এ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামাতে সবসময় বিভিন্ন মাসলাক ও মাযহাবের এবং আহলে হাদীস ছাত্রদের এক বিরাট জামাত অধ্যায়ন করে আসছে। আবার এদের অনেকে শিক্ষকতার দায়িত্বও পালন করছেন।

নদওয়াতুল উলামা তাদের প্রতিষ্ঠানসমুহের জন্য যে বুনিয়াদী মুলনীতি গ্রহণ করেন তা হলো এই যে, সরকারের নিকট হতে কখনো কোন প্রকার অনুদান ও

সহযোগিতা গ্রহণ না করা। বরং এ প্রতিষ্ঠান মুসলিম জনসাধারণের সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতা এবং শিক্ষকগণের ইখলাস, কুরবানী ও লিল্লাহিয়তের বুনিয়াদের উপর চলবে।

নদওয়াতুল উলামার দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্ম পদ্ধতি

আক্বীদাগত ও দ্বীনী বিষয়ে নদওয়াতুল উলামার মাসলাক ও দৃষ্টিভঙ্গি খালেস দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর মাঝে অন্য কিছুর মিশ্রণ ও প্রভাব থেকে পবিত্র, তাবিল বা মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে মুক্ত, ধোঁকা ও প্রতারণা হতে বিরত এবং এ ধরণের অপতৎপরতা হতে বেঁচে থাকতে সচেষ্ট।

দ্বীনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এবং এ জন্যে শব্দ ও বাক্য চয়নের ক্ষেত্রে ইসলামের প্রথম ও প্রধান স্বচ্ছ ও পবিত্র উৎস হতে উপকৃত হয়েছে এবং সেগুলোকে গ্রহণ করেছে।

আমল ও আখলাকের ক্ষেত্রে দ্বীনের মূল উৎস ও মূল কথাকে গ্রহণ করা, তার উপর অটল অবিচল থাকা এবং শরীআতের বিধি-বিধানের উপর আমল করার ক্ষেত্রে দ্বীনের বাস্তব বিষয়ে এবং দ্বীনী চেতনার অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাকওয়া ও বাতিনী ইসলাহের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইসলামী ইতিহাসের ক্ষেত্রে নদওয়াতুল উলামার দৃষ্টিভঙ্গি হলো এই যে, ইসলামের প্রথম ও সোনালী যুগই হলো সর্বোত্তম ও স্বর্ণ যুগ এবং যারা প্রিয় নবী (সা.)-এর সোহবত ও স্নেহলাভে ধন্য হয়েছিলেন এবং নববী মাদরাসাতে তারবিয়ত হাসিল করেছিলেন কুরআনী ও ঈমানী মাদরাসা হতে শিক্ষা হাছিল করে বের হয়েছিলেন তারাই হলেন সর্বোত্তম আদর্শের অধিকারী এবং অনুকরণযোগ্য মানব প্রজন্ম। আমাদের কামিয়াবী ও সফলতা এবং মুক্তি ও প্রশান্তি তাঁদের আদর্শকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা ও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার মাঝে নিহিত রয়েছে।

শিক্ষা ও শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে নদওয়াতুল উলামার দৃষ্টিভঙ্গি এ মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, ইলম স্বয়ং একটি স্বতন্ত্র সত্তা, যা আধুনিক ও প্রাচীন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝে বিভাজনের দাবি রাখে না। যদি একে বিভাজন করা সম্ভব হয়, তাহলে বলতে হয় যে, এটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং উপায় ও উপকরণের দিক থেকে সঠিক ও ভুল, কল্যাণকর বা অকল্যাণকর।

কোন বিষয় হতে উপকৃত হওয়া এবং কাউকে উপকৃত করা, কোন বস্তুকে গ্রহণ করা বা পরিহার করার ক্ষেত্রে প্রিয় নবী (সা.)-এর প্রজ্ঞাময় ইরশাদের উপর আমল করা যে,

اَلْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَأَيْنَ يَجِدُهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا۔

"হিকমত মুমিনের হারানো সম্পদ, এ সম্পদ যেখানেই পাওয়া যাবে মুমিন তা দ্বারা উপকৃত হবার অধিক হক রাখে।"

এর সাথে এ প্রজ্ঞাময় মূলনীতিকে গ্রহণ করে যে, "পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বস্তু গ্রহণ করো এবং নোংরাকে পরিহার করো।"

ইসলামের প্রতিরক্ষা ও আধুনিক ধর্মহীন ফেতনা মুকাবিলা করার জন্য নদওয়াতুল উলামার দৃষ্টিভঙ্গি এ মুলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে,

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ۔

"তাদের মুকাবিলা করার জন্য তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী সব ধরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখ।"

ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগ এবং ইসলামের শাশ্বত পায়গাম ও অনুপম আদর্শ ও রীতিনীতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং ইসলামের সত্য হওয়া ও তা বাস্তবসম্মত হওয়ার বিষয়ে মানুষের দিল ও দেমাগকে আশ্বস্ত করার ক্ষেত্রে নদওয়াতুল উলামার দৃষ্টিভঙ্গি এ মুলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত :

كَلِّمُوا النَّاسَ عَلٰى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّكَذَّبَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ۔

"তোমরা মানুষের মেধা ও ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী কথা বলো। কারণ তোমরা কী চাও যে, আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক?"

আক্বীদা ও দ্বীনের মুলনীতির ক্ষেত্রে নদওয়াতুল উলামার দৃষ্টিভঙ্গি হলো, জমহূরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআতের মাসলাকের অনুসরণ, সালাফে সালেহীনের মতাদর্শ ও গবেষণার পরিমন্ডলে সীমাবদ্ধ থাকাকে জরুরী মনে করা এবং ফিকহী ও শাখাগত মাসয়ালার ক্ষেত্রে নদওয়াতুল উলামার দৃষ্টিভঙ্গি হলো যতসম্ভব ইখতেলাফী মাসয়ালা-মাসায়েল নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা থেকে বিরত থাকা এবং এমন কোন কার্যকলাপ না করা যদ্বারা পারস্পারিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়, উম্মতের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হয়। বরং এ ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামগণের ব্যাপারে সুধারণা পোষন করা ও তাঁদের জন্য ওজর তালাশ করা এবং ইসলামের সামষ্টিক স্বার্থকে অন্য সকল স্বার্থের ঊর্ধ্বে রাখা।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, নদওয়াতুল উলামার দৃষ্টিভঙ্গি হাকিমুল ইসলাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর ইলমী ও ফিকরী, ফিকহী ও আক্বীদাগত দৃষ্টিভঙ্গির বেশি নিকটে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। এদিক থেকে নদওয়াতুল উলামার দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে একটি উদার, ব্যাপক ও সম্প্রসারিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও চিন্তা-চেতনা সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান।

আল্লামা সাইয়িদ সুলায়মান নাদভী (রহ.)

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা থেকে ফারেগ আলিমগণের মধ্যে আল্লামা সাইয়িদ সুলায়মান নদভী (রহ.) বিশেষ বৈশিষ্টের দাবিদার ছিলেন। তাঁকে সমকালীন মুসলিম বিশ্বের শীর্ষ আলিম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে গণনা করা হয়। তিনি ইসলামী দর্শনের ব্যাখ্যা, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থক ও একনিষ্ঠ সহযোগী, তৎকালীন যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও লেখক এবং যুগের বিরল প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে পূর্ণ দক্ষতা ও সামর্থ্য রাখতেন। ইতিহাস বিষয়ে তিনি মুজতাহিদ সুলভ দক্ষ ছিলেন, কুরআন, দর্শনশাস্ত্রে ও সমাজ বিজ্ঞানে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ও প্রশস্ত জ্ঞান ছিল।

তিনি উর্দূ ভাষার স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির লেখক ও সাহিত্যিক ছিলেন। আরবীতে তাঁর দক্ষতা ছিল এবং কবিতা ও কবিতা বিষয়ে উঁচুমানের বোদ্ধা ছিলেন। আরবী ও উর্দূ উভয় ভাষাতে কবিতা লেখার যোগ্যতা ছিল। তিনি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রাখতেন এবং বিরোধীদেরকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন। কঠিন থেকে কঠিনতর কথা হজম করতে সক্ষম ছিলেন। ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে দলবাজি করা থেকে বিরত থাকতেন। সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি 'দারুল মুসান্নিফীন আজমগড়' এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'সীরাতে আয়েশা', 'খুতবাতে মাদরাজ', 'হায়াতে মালেক', 'আরদুল কুরআন', 'আরব ও হিন্দ কি তায়াল্লুকাত' তার অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী ও শক্তিশালী গ্রন্থ। এ ধরনের গ্রন্থ অন্যান্য ভাষাতে পাওয়া মুশকিল। এসব থেকে অধিক জনপ্রিয় ও সমাদৃত গ্রন্থ হলো তাঁর 'সীরাতুন্নবী'। এ গ্রন্থের শুভ সূচনা করেন তাঁর শ্রদ্ধেয় উস্তাদ আল্লামা শিবলী নুমানী (রহ.)। তিনি এ গ্রন্থের শেষের পাঁচখন্ড রচনা করেন। এখানে তিনি ইসলামী শরীআতের এবং দ্বীনী বিষয়ের বুনিয়াদী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের বিস্তারিত ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন।

তিনি অগাধ পান্ডিত্য, গভীর অধ্যয়ন, প্রশস্ত জ্ঞানভান্ডার, লেখা ও গ্রন্থ রচনা এবং স্বতন্ত্র সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও পাক্কা দ্বীনদার, মুত্তাকী ও পরহেজগার, শরীআতের পাবন্দ, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী এবং সকল বিষয়ে তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তনকারী ছিলেন এবং ইসলামের পতাকা সমুন্নত

রাখার জন্য ব্যাকুল ও অস্থির থাকতেন। আল্লামা ইকবাল সহ অসংখ্য শীর্ষ আলিমগণ এ বিষয়ে স্বীকৃতি দান করেছেন।

তিনি ১৪ই রবিউল আউয়াল ১৩৭৩ হিজরী মুতাবিক ১৯৫৩ সালে করাচীতে ইন্তেকাল করেন এবং মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী (রহ.)-এর পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত হন। তার নামাযে জানাযাতে কয়েক লাখ মানুষ শরীক হয়।

আরব বিশ্বে সৃষ্ট বিপ্লব ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে নদওয়াতুল উলামার দৃষ্টিভঙ্গি

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা হতে উত্তীর্ণ হওয়া আলিমগণ আরব বিশ্বের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতো। তাঁরা সেসব দেশের রাজনৈতিক নেতাদের চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেসব দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সেসব দেশের লেখক ও গণমাধ্যমকর্মীগণ যেভাবে মুসলমানদের মাঝে ইসলামী চেতনা দূর্বল করা ও তাদেরকে ইসলামী নেতৃত্ব হতে দূরে সরিয়ে রাখা এবং ইসলামকে নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতা হতে দূরে সরিয়ে রাখা, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিল্প ও টেকনোলজীর দূর্বলতা ও অক্ষমতাকে তুলে ধরার জন্য কলম ধরেছিল, সে বিষয়ে তাঁরা অবহিত ছিলেন। সেসব দেশের জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা প্রবাহ ও দেশের অভ্যন্তরে সৃষ্ট নিত্য নতুন আন্দোলন এবং আরব নেতা ও লেখকদের আরব জাতীয়তাবাদকে নিজেদের পরিচয় হিসেবে গ্রহণ করে আরব জাহিলিয়াতের সাথে নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করার প্রয়াস ও অপচেষ্টা সম্পর্কে সরাসরি অবহিত হতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে, আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা হতে উত্তীর্ণ হওয়া আলিমগণ আরব বিশ্বের সামনে ইসলামের সঠিক চিত্র তুলে ধরতে এবং ইসলামের ব্যাপারে তাদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং আরব জাতীয়তাবাদের তেলেসমাতি ও জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বিভক্ত উম্মতকে কালেমার বুনিয়াদের উপর এক করার ক্ষেত্রে নিজেদের কলমী ও বাকশক্তিকে ব্যবহার করতে সক্ষম হন।

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা হতে একদিকে 'আল-বা'ছুল ইসলামী' নামে মাসিক আরবী পত্রিকা, ও 'আর-রায়েদ' নামে পাক্ষিক আরবী এবং 'তামিরে হায়াত' নামে পাক্ষিক উর্দূ পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকে। এ ছাড়া লেখক নিজে ও দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা হতে উত্তীর্ণ হওয়া আলিমগণ এমন

কিছু গ্রন্থ রচনা করেন যা আরব বিশ্বে অত্যন্ত সমাদৃত হয় এবং আরব বিশ্বের আলিম, জ্ঞানী-গুণী ও লেখকগণ ঐসব গ্রন্থের প্রাণ খুলে স্বীকৃতি প্রদান ও সমাদর করেন। এর পাশাপাশি দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামাতে' মজলিসে নাশরিয়াত ও তাহকীকাতে ইসলাম' নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে এবং এ প্রতিষ্ঠান হতে এমন মুল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ হতে থাকে, যা আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর নড়বড়ে ঈমান মজবুত করতে এবং ইসলামের ব্যাপারে থাকা তাদের সংশয় ও সন্দেহ দূর করতে সক্ষম হয়। ইসলাম সকল যুগে চিন্তাগত, আক্বীদাগত ও চেতনাগতভাবে বিশ্বনেতৃতের আসনে সমাসীন হবার যোগ্যতা রাখে এ আস্থা বহাল করতে এবং দাওয়াত তাবলীগের ময়দানে উত্তম নমুনা পেশ করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে, এ সকল গ্রন্থ বর্তমানে 'আঁধার রাতের মুসাফিরদের জন্য আলোর মশালের' ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছে এবং ইসলামের অবিনশ্বর হবার দলীল ও ইসলামের প্রতিটি যুগে মুসলিহ ও মুজাদ্দিদগণের ধারাবাহিক ইতিহাস পেশ করতে সক্ষম হয়েছে।

এ ছাড়া দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়। এ সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলো দ্বীনী মনোভাব ও সাহিত্য ভান্ডার দ্বারা সমৃদ্ধ। এর মাঝে দ্বীনের প্রেরণা যেমন রয়েছে, তেমনি দ্বীনী চেতনা ও মনোভাব সৃষ্টি করার যোগ্যতাও রয়েছে। বস্তুত এ সকল সাহিত্য গ্রন্থ দ্বারা ইসলামী আক্বীদার মৌলিক বিষয়গুলো, যেমন তাওহীদ ও রিসালত, আখিরাতের প্রতি ঈমান এবং নবীগণের জীবনীকে সরল ও সাবলীল ভাষায় গল্পের মাধ্যমে পেশ করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে তাদ্বারা শিশু-কিশোরদের মন-মস্তিষ্ক সহজেই প্রভাবিত হয়েছে।

আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ 'কাসাসুন নবীয়্যীন' সম্পর্কে মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রহ.) বলেন "এটি শিশুদের ইলমে কালাম বা আক্বীদার কিতাব।" আর আরব বিশ্বের বিশিষ্ট চিন্তানায়ক ও মুজাহিদ লেখক সৈয়দ কুতব শহীদ (রহ.) এ কিতাবের ভূমিকাতে স্বীকৃতি স্বরূপ লিখেন "এ কিতাব মিসরের শিক্ষা মন্ত্রালয় কর্তৃক প্রণীত কাসাসুল আম্বিয়া লিল আতফাল' হতে বহুগুণ কল্যাণকর ও সমৃদ্ধ।" অথচ এ গ্রন্থ রচনা বোর্ডে তিনি নিজেও শরীক ছিলেন।

তাবলীগী জামাত ও তার কর্মতৎপরতা

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রহ.) যখন মুসলমানদের মাঝে দ্বীনী চেতনা কম হতে এবং ব্যাপকহারে বেদ্বীনী মনোভাব সৃষ্টি হতে এবং পাশ্চাত্য

শিক্ষা ও সভ্যতার আগ্রাসন ও সাম্রাজ্যবাদ ইংরেজ সরকারের ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের ব্যাপক প্রভাব প্রত্যক্ষ করেন এবং সেই সাথে বেশ কিছু আলিম-উলামাকে জাগতিক ভোগ-বিলাসের শিকার হতে ও দুনিয়াবী প্রাচুর্যের প্রতি লালায়িত ও দ্বীনী দাওয়াতের যিম্মাদারী হতে গাফিল দেখতে পান, যখন তিনি মাদরাসাসমূহকে সমুদ্রের মাঝে একটি ভাসমান দ্বীপের মত দেখতে পান এবং দেখতে পান মাদরাসার কাজে প্রভাব বিস্তার করার যোগ্যতার অভাব এবং প্রভাব গ্রহণ করার প্রবণতা অধিক হতে চলেছে, জনসাধারণের সাথে তাদের সম্পর্ক তুলনামূলক হারে কম হতে চলেছে এবং সামাজিক জীবন হতে তারা বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে, তখন তিনি এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে শুরু করেন যে, এ নাজুক মুহূর্তে নির্জনতা অবলম্বন করা, শান্তিময় জীবন-যাপন করা এবং সীমিত পরিসরে তালিম ও তাদরীসের খিদমতে আত্মোনিয়োগ করাকে যথেষ্ট মনে করা কোন অবস্থাতেই সুখ ও কল্যাণকর নয়। বরং এ অবস্থাকে পরিবর্তন করার জন্য সর্বাবস্থায় সাধারণ জনগণের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা অতি জরুরী।

এ ক্ষেত্রে সামান্য বিলম্ব করা ধ্বংসের কারণ বলে বিবেচিত হবে। কারণ, অসুস্থ রোগী নিজের রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে বেখবর। তাই মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রহ.) মুসলিম জনসাধারণের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের দিলে ঈমান সিঞ্চিত করা, বিশুদ্ধ তাওহীদ, দ্বীনের বুনিয়াদী ও জরুরী মাসয়ালা-মাসায়েল তাদের দিল ও দেমাগে গেঁথে দেয়াকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। এরপর তিনি ইসলামের হুকুম-আহকাম, দ্বীনী ইলম ও যিকির-আযকারের প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং এক্ষেত্রে ঐ সকল আদব ও নিয়ম-কানুন-এর প্রতি যত্নবান হওয়ার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন, যা দ্বারা দাওয়াতের ময়দানে প্রভাব ফেলা সম্ভব এবং তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার ফেতনা ও পরীক্ষা হতে নিরাপদ রাখা সহজ হয়। ইকরামুল মুসলিমীন, তথা মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর হওয়া, অহেতুক কথা হতে বিরত থাকা, কাজের সাথে সম্পর্ক নেই এমন কাজ পরিহার করা তাঁর কাজের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি।

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রহ.) স্বীয় দাওয়াত ও কর্মতৎপরতা ভারতের অত্যন্ত নিম্ন এলাকাতে শুরু করেন। এ এলাকাতে অজ্ঞতা, ভ্রষ্টতা ও দ্বীনী বিষয়ে মূর্খতা চরম পর্যায়ে ছিল। এ এলাকাটি দিল্লীর দক্ষিণে অবস্থিত এবং তা 'মেওয়াত' নামে প্রসিদ্ধ।

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রহ.) ঐ এলাকার লোকদেরকে নিজের কাজকর্ম ও নিজের এলাকা ত্যাগ করে কিছুদিনের জন্য অন্য এলাকাতে গিয়ে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করার জন্য হিদায়াত দেন। কারণ, মাওলানা (রহ.) মনে

করতেন যতক্ষণ এ সকল লোক নিজেদের অরাজকতাপূর্ণ পরিবেশ ত্যাগ না করবে, যেখানে তারা জীবন যাপন করছে, ততক্ষণ তাদের জন্য দ্বীন শিক্ষা করা ও দ্বীনের বুঝ গ্রহণ করা, নিজেদের আখলাক গঠন করা ও তা সুন্দর করা এবং একটি পবিত্র ও শরীআত সম্মত জীবন যাপন করা সম্ভব নয়।

এ এলাকার হাজার হাজার লোক হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর আহবানে সাড়া দেন এবং তারা শুধু দু'এক দিন বা সপ্তাহের জন্য নয়, বরং মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে দূরদূরান্ত এলাকাতে পায়ে হেঁটে বা যানবাহনে করে সফর করছে এবং নিজেরা দ্বীন শিখেছে, আখলাক গঠন করেছে এবং নিজেদের ভিতর দ্বীনী মনোভাব সৃষ্টি করেছে।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রহ.)-এর এ দাওয়াত দেখতে দেখতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ দাওয়াত দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ও মানুষের দিলে প্রভাব বিস্তার করার পিছনে কোন প্রচার-প্রপাগান্ডার হাত ছিল না বা পত্রিকার প্রচার ও প্রচারণা বা সরকারি অর্থের পৃষ্ঠপোষকতা ও জনসাধারণের দানের কোন ভূমিকা ছিল না। যদি এর পিছনে কোন বস্তু ভূমিকা পালন করে থাকে, তাহলে তা হলো তাঁর দাওয়াতের কর্মপদ্ধতি ইসলামের প্রথম যুগের দাওয়াতী ও ইসলাহী কর্ম পদ্ধতির সাথে অধিক পরিমাণে মিল রাখত এবং এ জামাতের সাথে সম্পৃক্ত লোকজন প্রতিটি কাজকর্মে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও ইখলাসের জযবা রাখত । তাদের দেখে ঐ সকল মুখলিস বান্দার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যারা দাওয়াত ও জিহাদের ময়দানে সকল ধরনের কষ্ট-ক্লেশ হাসিমুখে বরণ করেছেন এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু তাঁদের জীবনের কামনা ছিল না।

আস্তে আস্তে এ কাজের পরিধি ভারতের বাইরে বহিঃবিশ্বে এবং অন্যান্য মহাদেশে বিস্তার লাভ করে। আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মত দেশে জামাতের আসা যাওয়া শুরু হয়। এ দ্বারা দাওয়াত প্রদানকারীর জীবনের পরিবর্তন ঘটত, নিজের ও অন্যদের ইসলাহের ফিকির তাদের মধ্যে পয়দা হতো এবং এ জন্য তাদের মাঝে কুরবানী দেবার জযবা সৃষ্টি হত।[১]

উল্লেখ্য যে, তাবলীগের জন্য ঘর হতে বের হবার উদ্দেশ্য ও ফলাফল শুধু যে অন্যের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌছে দেয়া, তা নয়; বরং নিজের ইসলাহ ও

---

১. এ বিপ্লবী দাওয়াত ও তার প্রবর্তক হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রা)-এর জীবন ও কর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য লেখক কতৃক প্রণিত 'হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রা) ও তার দ্বীনী দাওয়াত' দেখুন।

দ্বীন শিক্ষার ফিকির করা। কারণ, এসব বিষয় নিজের ঘর ও কাজকর্ম ত্যাগ করা ছাড়া সম্ভব হয়ে ওঠে না।

বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের অনেক এলাকাতে তাবলীগ জামাতের পরিচয় 'ওহাবী জামাত' হিসেবে। কারণ, এ জামাত শির্কী আক্বীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এবং জাহিলী রসম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে কথা বলে। তাই বিদ'আতী মহল ও আহমদ রেযা খানের ভক্তবৃন্দ এ জামাতের বিরুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তারা তাবলীগ জামাতের বিরোধিতা করাকে নিজেদের প্রধান পরিচয় বলে মনে করেন এবং তারা এ জামাতকে ওহাবীদের এজেন্ট বলে প্রচার করে থাকেন। তারা মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তাকবিয়াতুল ঈমান'-এর প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেন এবং তাবলীগ জামাতের কর্মতৎপরতাকে সীমাবদ্ধ করার জন্য জাহিলী যুগের কাফির-মুশরিকদের অস্ত্র ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করেন না। কারণ, কাফিরদল কুরআন ও ইসলামী দাওয়তের বিরুদ্ধে বলত–

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَ الْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ-

"কাফিররা বলে, তোমরা এ কুরআনকে শ্রবণ করবে না বরং কুরআন তিলাওয়াতের সময় অধিক হৈ চৈ কর যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।"

[সূরা হা মীম সাজদাহ : ২৬]

কিন্তু এ বিষয়ে আল্লাহ্ সাক্ষী যে, এ সকল মিথ্যা অপবাদ ও অপপ্রচার এবং বিভিন্ন নির্যাতনের কারণে এ সকল মহামণিষীবৃন্দের মনোবল ভাঙ্গার পরিবর্তে তাদের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ও সংকল্প আরো অটল অবিচল হয়েছে। তাদের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ও দৃঢ় সংকল্প এবং নরম কথাবার্তা ও কঠিন কথা শ্রবণ করে চুপ থাকার কারণে অসংখ্য বিরোধিতাকারী তাদের মুখলিস কর্মীতে পরিণত হয়েছে এবং একটি সুবিশাল জামাত শির্ক ও বিদ'আত হতে তাওবা করে বিশুদ্ধ আক্বীদা-বিশ্বাসের দাওয়াত কবূল করেছে, গোমরাহী হতে ফিরে হিদায়তের পথে চলতে শুরু করেছে। এ বাস্তবতার সাক্ষ্য এমন প্রতিটি ব্যক্তি প্রদান করবেন যারা তাবলীগের মেহনত হয় এমন এলাকাতে যাওয়া আসা করেন।

সুতরাং এখন যদি দাওয়াতী ও ইসলাহী প্রচেষ্টাকারী, এ রাস্তায় প্রচুর কুরবানী এবং এর ফলে অর্জিত গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য সফলতার পাশাপাশি এ জামাতের কোন সদস্যের মাঝে আক্বীদাগত নয়, বরং আমলী ত্রুটি ও

অনিচ্ছায় কোন প্রকার তিরস্কারযোগ্য অপরাধ হয়ে যায়, তাহলে তাকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষের অসাবধানতা এবং এ জামাতের কর্মপদ্ধতি ও মূলনীতি সম্পর্কে তাদের বুঝের অভাবের কারণে হয়েছে; এ জন্য পুরা জামাতকে দোষারোপ করা সমীচীন নয়।

পরিশেষে, এ পরিচিতি ও পর্যালোচনা আল্লামা সাইয়িদ সুলায়মান নদভী (রহ.)-এর লেখা ভূমিকার শেষ অংশ দ্বারা পরিসমাপ্তি করতে চাই, যা তিনি লেখকের প্রণীত 'হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রা) ও তার দ্বীনী দাওয়াত' গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে লিখেছেন :

"দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি সম্পর্কে যা কিছু পেশ করা হলো তা দ্বারা ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় এবং যতটুকু আমার ধারণা, পরবর্তী আলোচনাতে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে এবং দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি ও তার ইলমী ও আমলী নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে যে সকল বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে তা সমকালীন ভারতবর্ষের সকল দ্বীনী আন্দোলনের মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি হতে অধিক কুরআন ও সুন্নাহর নিকটবর্তী।

হিকমতপূর্ণ দাওয়াত ও তাবলীগ, 'আমরু বিল মা'রূফ ও নাহী 'আনিল মুনকার' ইসলামের মেরুদন্ডের হাড় সমতুল্য এবং এরই উপর ইসলামের বুনিয়াদ, ইসলামের শক্তি, ইসলামের ব্যাপকতা ও ইসলামের সফলতা নির্ভর করছে। অন্যান্য যুগের তুলনায় বর্তমান যুগে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের অধিক প্রয়োজন এবং অমুসলমানদেরকে মুসলমান বানাবার চাইতে মুসলমানদেরকে মুসলমান হিসেবে রাখা, নামেমাত্র মুসলমানদেরকে আমলধারী মুসলমান এবং খান্দানী মুসলমানকে দ্বীনী মুসলমানে পরিণত করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বাস্তব কথা হলো, বর্তমানের মুসলমানদেরকে দেখে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের কথা মনে পড়ে : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا 'হে মুমিনগণ ! তোমরা ঈমান আন।'

এবং এ আয়াতের পয়গামকে জোরে শোরে ও সুউচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা প্রদান করা উচিত। গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে এবং প্রতিটি মুসলমানের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নামধারী মুসলমানকে খাঁটি মুসলমান বানাবার প্রচেষ্টা করা জরুরী এবং এ কাজের জন্য ঐ ধরনের ত্যাগ ও কুরবানী, কঠিন মেহনত, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, দৃঢ় সংকল্প এবং হিম্মত ও মুজাহাদা করা উচিত, যা সাধারণত দুনিয়ার মানুষ দুনিয়াবী মান-সম্মান, প্রতিপত্তি ও শক্তি-সামর্থ্য অর্জন করার জন্য ব্যয় করে। এ

সকল বিষয় অর্জন করার জন্য তারা সকল প্রিয় বস্তু উৎসর্গ করতে ও সকল প্রতিবন্ধকতাকে দূর করতে প্রস্তুত থাকে। এ জন্য তার মাঝে অবিশ্বাস্য শক্তি পয়দা হয়, তার প্রতি যাদুময় আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, তার জন্য মরণপণ চেষ্টা করে, জান ও মাল খরচ করে এবং এ পথে সর্বদিক থেকে অগ্রসর হবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকে। মোট কথা, তা অর্জনের জন্য তার মাঝে এক ধরনের নেশা সৃষ্টি হয়। কারণ এ ধরনের নেশা ছাড়া দ্বীনী বা দুনিয়াবী কোন মহৎ কাজ কখনো সম্পাদন হয়নি এবং না কখনো হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

আপনি যদি বর্তমান যুগে এ ধরনের নেশা দেখতে চান তাহলে মুল গ্রন্থটি পড়া শুরু করুন।"

অধম

মে ১৯৪৭, ভূপাল সাইয়িদ সুলাইয়মান নাদভী

অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতি

বর্তমান যুগে মুসলমানগণ যে সকল বিপদের সম্মুখীন, যে ধরনের সমস্যার মাঝে ডুবে রয়েছে এবং যে নাজুক পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হচ্ছে ও ইতিহাসের যে কঠিন সংকটের সাথে পাঞ্জা লড়তে হচ্ছে, তা মুসলমানদেরকে কোনভাবে অনুমতি প্রদান করে না যে, মুসলমানগণ পারস্পারিক মতপার্থক্যের মাঝে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য নষ্ট করবে। কারণ, এসব বিষয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনা শেষ হয়ে গেছে এবং শত শত বছর যাবত এর উপর আমল চলে আসছে। তাই এখন কোন ফিকহি ইখতিলাফের কারণে পারস্পারিক বিরোধ সৃষ্টি করা উচিত নয়। কারণ, এর মৌলিক কোন গুরুত্ব নেই এবং এ সকল বস্তু মুসলিম উম্মাহর জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনতে সক্ষম নয়। তাই, মুসলিম উম্মাহর শক্তি-সামর্থ্য কোন গঠনমূলক কাজে ব্যয় হওয়া উচিত এবং আখলাকী বিগাড়, শির্কী আক্বীদা-বিশ্বাস, জাহেলী রসম-রেওয়াজ এবং অনৈসলামী জীবন পদ্ধতিকে ইসলাহ করাকে নিজেদের সকল প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

তাওহীদ ও শরীআতের উপর আমলকারী এবং হারামকাজ বর্জনকারীদের শুধুমাত্র দলীলভিত্তিক ফিকহী মতপার্থকের কারণে পরস্পরকে সমালোচনা করা– যাকে লেখক একটি আরবী পুস্তিকাতে উল্লেখ করেছেন "উদ্দেশ্যহীন জিহাদ ও দুশমনবিহীন রণহুংকার সমতুল্য"। কারণ এ ধরনের ফিকহী ইখতিলাফ সব সময় থাকবে।

ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের সংকল্প ও পরিকল্পনা সম্পর্কে যারাই অবগত আছেন তারা অবশ্যই বুঝতে সক্ষম যে, যে ভারতকে মুসলমানগণ আটশত বছর শাসন করেছে এবং এ দেশকে শিক্ষা-সংস্কৃতি, সুশৃংখল ও অর্থনৈতিক উন্নতির দিক থেকে উন্নতির শীর্ষে পৌছে দিয়েছিল, তাকে তারা দ্বিতীয় স্পেন বানাবার পূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ভারতের মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি ও ভাষাকে নির্মূল করার প্রচেষ্টা করছে। তারা মুসলমানদের ধর্ম ও অর্থনৈতিকভাবে দেওলিয়া করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এর প্রমাণ হলো, তারা তাদের শিক্ষানীতিতে হস্তক্ষেপ শুরু করেছে, হিন্দী ভাষাকে বাধ্যতামূলক করেছে, মুসলিম পার্সনাল ল'-এর পরিবর্তে সকল নাগরিকের জন্য একই ধরনের আইন বাস্তবায়ন করতে বদ্ধপরিকর, উর্দূ ভাষাকে উৎখাত করেছে এবং হিন্দী ও ইংরেজী পত্রিকাগুলোতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উসকে দেয়া হচ্ছে। বিভিন্ন দলের নেতার ও বেশ কিছু মন্ত্রীর বয়ান ও বক্তৃতা, পরিকল্পনাগুলো রিপোর্টের আকারে পত্রিকার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌছে দেয়া হচ্ছে। এরূপ নাজুক পরিস্থিতিতে মুসলমানগণ পরস্পরে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়া ভয়ানক অপরিণামদর্শিতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া আর কিছু নয়।

মাদরাসার ছাত্রদের মর্যাদা ও দায়িত্ব-কর্তব্য

(প্রবন্ধটি ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে দারুল উলূম দেওবন্দে ছাত্রদের এক সভায় পাঠ করা হয়। পরে তা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়।)

প্রিয় ছাত্রবৃন্দ! আপনারা দ্বীনী মাদরাসার শিক্ষার্থী; আর আমি তার নগণ্য খাদেম ও আপনাদের সহযাত্রী। এ প্রসঙ্গে কিছু কথা আজ আরয করতে চাই। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও বর্তমান যুগের দাবি হচ্ছে, আমি আপনাদের সামনে জীবনের অভিজ্ঞতার এবং সীমিত অধ্যয়নের ফলাফল নিঃসংকোচে ব্যক্ত করি। যাত্রাপথে প্রাপ্ত সবচেয়ে মূল্যবান ও প্রিয় সওগাত আপনাদের সামনে পেশ করি। আপনারা আমাকে কিছু কথা আরয করার সুযোগ দিয়ে অনেক অনেক সম্মান দান করেছেন এবং পূর্ণ আস্থা ও মুহব্বতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাই, আমি সেই মুহব্বত ও আস্থার যথাযথ মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করব এবং আপনাদের ব্যস্ততম জীবনের এ সংক্ষিপ্ত সময় থেকে উপকৃত হওয়ার প্রয়াস পাব।

কারণ, আপনাদের এ সময় মহামূল্যবান। আপনাদের প্রতিটি মুহূর্তকে সাধারণ মানুষের একমাস, এমনকি এক বছরের সাথে তুলনা করা চলে।

মাদরাসার পরিচয়

বন্ধুগণ! আমাদেরকে সর্ব প্রথম জানতে হবে, একটি দ্বীনী মাদরাসার মর্যাদা ও তার পরিচয় কি? মাদরাসা হলো এ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় কর্মক্ষেত্র। এখানে মানুষ তৈরি করা হয়, দ্বীনের দা'ঈ ও ইসলামের সিপাহী সালার তৈরি হয়। মাদরাসা হলো মুসলিম বিশ্বের পাওয়ার হাউয। যেখান থেকে মুসলিম জনবসতি তথা সারা দুনিয়ায় আলোক-রশ্মি বিতরণ করা হয়। মাদরাসা হলো এমন এক কারখানা, যেখানে মানুষের মন-মগজ, ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনা বিকশিত হয়, যেমন সৃষ্টিকুলের প্রতিটি অণু-পরমাণুর বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়।

মাদরাসা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করে। তার শাসন সারা দুনিয়ায় চলে কিন্তু দুনিয়ার কোন শাসন তার উপর চলে না।

মাদরাসার সম্পর্ক কোন বিশেষ কালের সাথে নয়। সুনির্দিষ্ট কোন তাহযীব-তমদ্দুন, কৃষ্টি-কালচার বা ভাষা ও সাহিত্যের সাথে নয়। তাই, তার

প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা বা তার স্থায়িত্ব নিয়ে দ্বিধাবোধ করার কোন অবকাশ নেই।

কারণ, মাদরাসার সম্পর্ক হলো সরাসরি নবূয়তে মুহাম্মাদীর সাথে, যা চিরন্তন ও সার্বজনীন। যে মানবতা সদা গতিশীল ও যে জীবন সদা চলমান, তার সাথে রয়েছে মাদরাসার সম্পর্ক। মাদরাসা মূলত প্রাচীনত্ব ও নতুনত্বের বিতর্ক থেকে সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে। কারণ, এতে নবূয়তে মুহাম্মাদীর অবিনশ্বরতা এবং মানব জীবনের উন্নতি-অগ্রগতি উভয়টিই পাওয়া যায়।

মাদরাসার সুমহান যিম্মাদারী

প্রিয় তালিবানে ইলম! কোন মাদরাসাকে যদি শুধু একটি মিউজিয়াম বা অতীত স্মৃতি সংরক্ষণের কেন্দ্র মনে করা হয়, তাহলে এটি হবে বড় আপত্তিকর বিষয়। আমি মনে করি মাদরাসা হলো এক শক্তিশালী ও মজবুত ঘাঁটি। উন্নতি-অগ্রগতি ও জীবন পরিচালনার এক জীবন্ত কেন্দ্র। তার এক প্রান্ত নবূয়তে মুহাম্মাদীর সাথে এবং অপর প্রান্ত মানবজীবনের সাথে সংযুক্ত। মাদরাসা নবূয়তে মুহাম্মাদীর জীবন্ত ঝর্ণা থেকে পানি সংগ্রহ করে জীবনরূপ ক্ষেত-খামারে তা সিঞ্চন করে।

মাদরাসা যদি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবহেলা করে, তাহলে সেই জীবনরূপ ক্ষেত-খামার শুষ্ক হয়ে যাবে, মানবতার অপমৃত্যু ঘটবে। আর তখন নবূয়তে মুহাম্মাদীর ঝর্ণার প্রবাহ বাকী থাকবে না। মানবতার পিপাসাও নিবৃত্ত হবে না।

রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবূয়তের ঝর্ণাধারা সদা-সর্বদা অবারিত, সকলের জন্য উন্মুক্ত। এতে কোন কার্পণ্য নেই, মানবতার ভিক্ষার ঝুলির প্রতি তার কোন বিমুখিতা নেই। প্রিয় নবী (সা.)-এর পবিত্র যবান থেকে যেমন একদিকে ইরশাদ হচ্ছে– إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي 'আমি তো শুধু বন্টনকারী আর আল্লাহ্ হলেন দাতা।' অপরদিকে মানবতা চিৎকার করে বলছে–

هَلْ مِنْ مَزِيْدٌ هَلْ مِنْ مَزِيْدٌ

"আরো পেতে চাই, আরো পেতে চাই।"

প্রিয় ছাত্র বন্ধুরা! মাদরাসার চেয়ে ব্যস্ত, গতিশীল ও প্রাণবন্ত কোন প্রতিষ্ঠান এ দুনিয়াতে থাকতে পারে না। মানব জীবনের সমস্যার কোন শেষ নেই, পরিবর্তন-পরিবর্ধনেরও কোন সীমা নেই। তার চাহিদা, কামনা-বাসনা অসংখ্য, ভুল-ভ্রান্তি, পদস্খলন ও গুনাহ বেশুমার। অতএব, মাদরাসা যেহেতু এ বৈচিত্র্যময়

জীবন পরিচালনার দায়িত্বভার নিজ কাঁধে বহন করেছে, তাই তার অবসর নেয়ার সুযোগ কোথায়? দুনিয়ার অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্মব্যস্ত থাকলেও তার অবসর নেয়ার সুযোগ আছে: কর্মবিরতির পথ আছে। কিন্তু মাদরাসার অবস্থা সেরূপ নয়। দুনিয়ার সকল মুসাফির বিশ্রাম নিতে পারে কিন্তু মাদরাসার জন্য মুহূর্ত পরিমাণ বিশ্রাম নেয়ার কোন কল্পনাও করা যায় না।

জীবন প্রবাহে যদি স্থিরতার অবকাশ থাকতো, তাহলে মাদরাসার জন্যও সামান্য বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু জীবনের গতিধারা যেহেতু থামবার নয়, তাই মাদরাসার কর্মবিরতির কোন প্রশ্নই আসে না।

জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নিরীক্ষণ করা, নতুন নতুন প্রশ্নের সমাধান দেয়া এবং বিভ্রান্ত মানুষকে দিক-নির্দেশনা দান করা মাদরাসার দায়িত্ব। মাদরাসা যদি তার যাত্রাপথে পিছনে থেকে যায় বা ক্লান্ত হয়ে কোথাও যাত্রা বিরতি করে অথবা মনোরম কোন দৃশ্য দেখে তার মন এর প্রতি আসক্ত হয়ে যায়, তাহলে এ গতিশীল জীবনের নেতৃত্ব দেবে কে? নবূয়তের চিরন্তন শাশ্বত পয়গাম তাকে কে শুনাবে?

মাদরাসার জন্য কোন রকম নিষ্ক্রিয়তা, কর্মবিমুখতা ও নেতৃত্ব থেকে দূরে থাকা আত্মহত্যারই শামিল; যা মানবতার সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোন আত্মসচেতন ও দায়িত্বশীল মাদরাসার ক্ষেত্রে তা কল্পনাও করা যায় না।

মাদরাসার ছাত্র ও ফারেগীন আলিমগণের যিম্মাদারী

বন্ধুগণ! মাদরাসার ছাত্র হিসাবে আপনাদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সুমহান। দুনিয়াতে এরচে' বেশি গুরুত্বপূর্ণ, নাজুক ও ব্যাপক দায়িত্ব বর্তমান যুগ-সন্ধিক্ষণে আর কোনো দল বা সংগঠনের আছে বলে আমি মনে করি না। পুনর্বার সে কথাটি ভেবে দেখুন যে, আপনাদের সম্পর্কের সূতিকার একপ্রান্ত নবূয়তে মুহাম্মাদীর সাথে জুড়ে রয়েছে, তো অপর প্রান্ত বাস্তব জীবনের সাথে। এ সুমহান গৌরব ও গুরুত্বপূর্ণ যিম্মাদারীর অধিকারী হওয়া আপনাদের মহত্ত্বের সবচেয়ে বড় দলীল।

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম! আপনারা নবূয়তে মুহাম্মাদীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যেমন বড় সৌভাগ্য ও সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন, তেমনি এক বিরাট যিম্মাদারী আপনারা নিজ স্কন্ধে বহন করছেন। আপনাদের নিকট

বাস্তবসম্মত আক্বীদা-বিশ্বাসের সবচেয়ে বড় দৌলত রয়েছে, যা অন্য কারো কাছে নেই।

নবূয়তে মুহাম্মাদীর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে আপনাদের উপর অসংখ্য দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। সুতরাং আপনার নিকট পাহাড়সম দৃঢ়-মজবুত ঈমান থাকতে হবে এবং এমন সাহসের অধিকারী হতে হবে, যাতে সারা দুনিয়ার বিনিময়ে হলেও কেউ আপনাদের ঈমানী চেতনা ও ধর্মীয় আদর্শ ক্রয় করার কল্পনাও করতে না পারে।

আপনাদের হৃদয়ে ঈমান সংরক্ষণ করার জযবা থাকতে হবে, এর উপর গর্ববোধ করতে হবে এবং সর্বান্তকরণে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।

আপনাদের অন্তরে ধর্ম সম্পর্কে সততা, যৌক্তিকতা ও চিরন্তনতার সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। তার অসীম শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব ও নির্ভুলতার ইয়াকীন রাখতে হবে।

আপনার নিজস্ব মতাদর্শের পরিপন্থী সব কিছুকে জাহিলিয়াতের মীরাস মনে করতে হবে।

আপনারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী, রসূলের হিদায়াত শোনার সাথে সাথে যেমন স্বতঃস্ফুর্তভাবে বলে উঠবেন سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا "আমরা শুনলাম ও মানলাম"। তেমনিভাবে জাহেলিয়াতের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও তার নীতিমালার কথা শুনে ব্যর্থহীন ভাষায় বলে উঠবেন :

كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ ـ

"আমরা তোমাদের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করলাম। তোমরা যতদিন এক আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস না করবে ততদিন তোমাদের ও আমাদের মাঝে শত্রুতা ও সংঘাত বিদ্যমান থাকবে।" [সূরা মুমতাহিনা : ৪]

দুনিয়াতে ইসলামই একমাত্র মুক্তির পথ। রসূলের আদর্শই একমাত্র শান্তির প্রতীক। তাঁর অনুকরণেই নিহিত রয়েছে সফলতা ও কামিয়াবীর চাবিকাঠি। ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির শ্রেষ্ঠত্ব এরই মাঝে লুকায়িত রয়েছে, এ বিশ্বাস হৃদয়-মনে বদ্ধমূল করতে হবে। একথা তো বাস্তব সত্য–

محمد عربی کہ ابروئے ہر دو سرا است
کسیکہ خاک درش نیست خاک بر سر او

"মুহাম্মাদ আরাবীই হচ্ছেন সম্মান ও মর্যাদার একমাত্র উৎস-স্থল,
তাঁর পদতলে যে নিজেকে বিলীন করতে না পারে, তার ধ্বংস অনিবার্য।"

ইলমে নবূয়তকে যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সার-নির্যাস মনে করতে হবে। দুনিয়ার মানব রচিত বস্তুকেন্দ্রিক তত্ত্ব-দর্শন, যুক্তি ও তর্ক-জ্ঞানকে কল্প-কাহিনীর ঊর্ধ্বে স্থান দেয়া যাবে না।

আপনাদের কাছে তাওহীদের পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে এবং এর উপর অবিচল আস্থা রাখতে হবে। শির্ক, কুফর ও প্রতিমা পূজার দর্শন যতই আকর্ষণীয় পন্থায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিভাষায় উপস্থাপন করা হোক, সেগুলোকে তুচ্ছ মনে করতে হবে। زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا "অন্তঃসার শূন্য, চাকচিক্যময় ভাষা" বলেই সেগুলোকে আখ্যা দিতে হবে।

সুন্নাতে রসূলের প্রতি আপনাদের লালায়িত হতে হবে এবং خَيْرُ الْهُدٰى هَدْىُ مُحَمَّدٍ (ص) "রসূলের আদর্শকে সর্বোত্তম আদর্শ" হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে। বিদ'আত-কুসংস্কারের ক্ষতি এবং আল্লাহ্‌র দরবারে তা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ইয়াকীন রাখতে হবে।

মোটকথা, আপনাদের বিশ্বাস, মতাদর্শ, রুচিবোধ, ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনায়; বরং দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপে নবূয়তে মুহাম্মাদীর ব্যাপকতা ফুটে উঠতে হবে।

মাদরাসার ছাত্র ও ফারেগীন আলিমগণের বৈশিষ্ট্য

বন্ধুগণ! দুনিয়াতে অন্যান্য মানুষের তুলনায় আপনাদের বিশেষত্ব রয়েছে অনন্য। কারণ, তারা মোটামুটি ঈমান আনলেই যথেষ্ট হবে। কিন্তু আপনাদের ঈমান মজবুত হওয়ার সাথে সাথে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান ও দৃঢ় আস্থা থাকতে হবে। শুধু মুখে স্বীকার করাই যথেষ্ট নয়; বরং তার দাওয়াতও দিতে হবে। সাধারণ লোকদের ঈমান শুধু নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে, কিন্তু আপনাদের ঈমান তাদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী হতে হবে। হাজারো, লক্ষ মানুষের ধ্যান-ধারণা পরিবর্তন করে দেয়ার শক্তি থাকতে হবে। আর এটা তখনি সম্ভব যখন আপনার হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ সবকিছু একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য উৎসর্গ করা হবে এবং তাগূতী শক্তির প্রতি আপনাদের মনোভাব হবে ঠিক তেমন, যেমন রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

يَكْرَهُ اَنْ يَعُوْدَ اِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ

"জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হতে যেমন মানুষ ভয় পায়, ঈমান আনার পর কুফরের প্রতি ধাবিত হওয়াকে ঠিক তেমনি ভয় পাবে।"

সাধারণ মানুষের কাছে নবূয়তের শিক্ষা মোটামুটি থাকলেই যথেষ্ট। কিন্তু ইলমে নবূয়তে আপনাদের সুগভীর জ্ঞান থাকতে হবে। এর প্রতি চরম আবেগ-উৎকণ্ঠা এবং সর্বস্ব বিলীন করে দেয়ার মানসিকতা লালন করতে হবে। তা না হলে মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয়ার বিষয়টি কল্পনাও করা যায় না। বরং এ ফিতনার যামানায় নিজেদের পুঁজি ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেঁচে থাকাই মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে।

আধ্যাত্মিক গুণাবলী

নবূয়তে মুহাম্মাদীর মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার ও সুবিপুল সম্পদ রয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে :

فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا هَذَا الْعِلْمَ

"আম্বিয়ায়ে কিরাম টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাননি। তাঁরা তো শুধু পরবর্তীদের জন্য ইলমের মীরাস রেখে গিয়েছেন।" কুরআন-হাদীস ও ফিকহ্ যথেষ্ঠ পরিমাণে সংরক্ষিত আছে। আলহামদু লিল্লাহ্! আর এ কারণে বর্তমান যুগে আপনাদের এ মাদরাসা উলূমে নবূয়ত শিক্ষাদানের এক বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

উপরোক্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারের সাথে সাথে আধ্যাত্মিক শিক্ষা, অভ্যন্তরীণ গুণাবলীও নবূয়তে মুহাম্মাদী দান করেছে। কুরআন-হাদীস ও ফিকহ্‌শাস্ত্র তথা জাহেরী উলূম যেমন যুগ যুগ ধরে সংরক্ষিত হয়ে আসছে, তেমনি আধ্যাত্মিক গুণাবলীও যুগ যুগ ধরে সংরক্ষিত হয়ে আসছে। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত উভয় জ্ঞান সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করেছেন।

আধ্যাত্মিক গুণাবলী হলো ইয়াকীন, ইখলাস, তায়াল্লুক মাআল্লাহ, খুশূ-খুযূ' দরদ, মুহব্বত, তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহ ইত্যাদি। এ উভয় জ্ঞানের সমষ্টির নাম হচ্ছে ইলমে নবূয়ত। ইরশাদ হচ্ছে–

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ۔

"তিনি এমন সত্তা যিনি নিরক্ষর মানুষের মধ্যে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁর আয়াত তিলাওয়াত করেন, লোকদের পূত-পবিত্র করেন, কিতাবুল্লাহর জ্ঞান ও হিকমত শিক্ষা দান করেন।" [সূরা জুমু'আ : ২]

অতএব, নবূয়তে মুহাম্মাদী থেকে শুধুমাত্র জাহিরী জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করলে আর আধ্যাত্মিক গুণাবলী ত্যাগ করলে নবূয়তের পূর্ণাঙ্গ ওয়ারিস হওয়া যাবে না। সঠিক অর্থে তাদেরকে নায়েবে রসূল বলা যাবে না।

দুনিয়াতে যাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতিনিধি হয়েছেন, ইসলামের পয়গাম আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন, তাঁরা ইলমে নবূয়তের আংশিক আমানতদার ছিলেন না, জাহিরী উলূম ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী উভয় দৌলতের তাঁরা অধিকারী ছিলেন। বর্তমান যামানাতেও ইসলামের দাওয়াত ও তার বিপ্লব সাধন করতে হলে শুধুমাত্র ইলমে নবূয়তের একাংশ দ্বারা তা করা যাবে না। যে বূযর্গানে দ্বীনের সাথে আপনাদের সম্পর্ক রয়েছে, তাঁরাও উভয় গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। অতএব, আপনারাও যদি খাঁটি নায়েবে রসূলের আসনে সমাসীন হতে চান, তাহলে নিজেদের মধ্যে জাহিরী উলূম ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী উভয়টির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা চালাতে হবে। এছাড়া যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান হলো কাগজের ফুলের ন্যায়, যাতে নেই কোন খোশবু, নেই কোন সজীবতা। দুনিয়ার বাজারে কাগজের ফুলের কোন অভাব নেই। আমরা শত চেষ্টা করেও এতে তেমন কিছু সংযোজন করতে পারব না। এখানে তো নবূয়তের বাগানের সজীব তরতাজা ফুলের প্রয়োজন, যার সুগন্ধিতে দিক-দিগন্ত মোহিত হয়ে যাবে এবং তার সামনে দুনিয়ার সমস্ত ফুল লজ্জায় মাথানত করে দিবে।

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا

"সত্য বিকশিত হলো আর তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণিত হলো।"

দ্বীনী মাদরাসাসমূহে আধ্যাত্মিক গুণাবলীর অবক্ষয়

আপনারা কিছু মনে করবেন না, আমিও আপনাদের মত একজন। আমাদের এ সমস্ত দ্বীনী মাদরাসায় অনেকদিন থেকে সেই তরতাজা সুগন্ধময় ফুল তৈরি হচ্ছে না। দিন দিন আমাদের মাঝে নৈতিক অবক্ষয় নেমে আসছে। হৃদয় পাষাণ করে রেখে আমাদের শুনতে হবে এবং বিবেচনা করতে হবে এ বিষয়টি কতটুকু সত্য যা কবি বলেছেন :

اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک

نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ.

"মাদরাসা ও খানকাহ হতে অশ্রুসিক্ত নয়নে বেরিয়ে এলাম কিন্তু
পেলাম না তো সেথায় আবে হায়াত,
মুহব্বত, মা'রেফাত ও প্রকৃত অর্ন্তদৃষ্টির সন্ধান।"

এ নৈতিক অবক্ষয়ের ফলে অতীতের তুলনায় শত-সহস্র গুণ ছাত্র প্রতি বছর ফারেগ হলেও, সমাজের উপর এর কোন কার্যকরী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হচ্ছে না।

কয়েকজন বিপ্লবী মানুষ

এ উপমহাদেশে অতীতে খাজা মু'ঈনুদ্দীন আজমিরী (রহ.), সাইয়িদ আলী হামাদানী কাশ্মিরী (রহ.)-এর মত সহায়-সম্বলহীন বুযর্গানে দ্বীন এসেছেন এবং তাদের হৃদয়ের উষ্ণতা, আবেগ-ব্যাকুলতা ও ঈমানের আলোক-রশ্মি দ্বারা সারা দেশ আলোকোজ্জ্বল করেছেন। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহ.) মুঘল সম্রাজ্যে এক বিস্ময়কর বিপ্লব সাধন করতে সক্ষম হোন। তাঁর নীরব ও মৌন প্রচেষ্টায় বাদশাহ আকবরের সিংহাসনে আমরা আওরঙ্গজেবের মত দ্বীনী ব্যক্তিত্ব সমাসীন হতে দেখেছি। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (রহ.) এসে এ সুবিশাল রাজ্যের গতিধারা সম্পূর্ণ পাল্টিয়ে দেন। তিনি মানুষের চিন্তা-চেতনা ও প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় এক বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেন। হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহ.) অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে এবং মুসলমানদের অধঃপতনের যুগে ইসলামের এক সুদৃঢ়-মজবুত দুর্গ নির্মাণ করেন এবং ইসলামী শিক্ষার নিথর দেহে সঞ্জীবনী শক্তি ফিরিয়ে আনেন। কিছুদিন পূর্বে মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) দ্বীনী দাওয়াত ও ঈমানী মেহনতের এক নতুন চেতনা দান করেছেন। মোট কথা–

جہانے زام دگر کون گردیک مرد خود آگاہی

"এক-একজন আত্মসচেতন ব্যক্তি এসে পৃথিবীকে নতুন রঙ্গে রঙ্গিণ করে দিয়েছেন।"

আজ আমাদের ফারেগ ছাত্রদের মধ্যে সে সকল গুণ ও রূহ নেই, যার দ্বারা মানুষ নিজেদের আত্মপরিচয় লাভ করবে এবং জীবনের গতিধারা পরিবর্তন করতে বাধ্য হবে।

আজকের যুগ বড়ই বাস্তবতার যুগ। মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের সামনেই সে শুধু মাথানত করে। উন্নত মস্তিষ্কের সামনেই সে বিনয়াবনত হয়। শূন্য হৃদয় পূর্ণ হৃদয়ের কাছে, নিরুত্তাপ মন-মগজ উষ্ণতার কাছেই হার মানে। আমাদের

মাদরাসাসমূহে চিন্তা-চেতনার অবক্ষয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। হৃদয়ের স্থবিরতাও বেড়ে চলেছে। বক্তা ও ওয়ায়েযদের এখন কোন অভাব নেই। কিন্তু একথা বাস্তব সত্য যা কবি জিগরের ভাষায় ফুটে উঠেছে–

آنکھوں میں سرور عشق نہیں

چہرے پر یقین کا نور نہیں

" চোখে নেই প্রেমের আনন্দ, চেহারায় নেই ঈমানের নূর।"

মাদরাসাসমূহের স্থবিরতা

দ্বীনী মাদরাসাসমূহ যা এক সময় রূহানিয়াতের প্রাণকেন্দ্র ছিল, বিপ্লবী মানুষ যেখান থেকে সৃষ্টি হতো, সেখানে আজ স্থবিরতা, হীনম্মন্যতা ও হতাশা বিরাজ করছে। আজ মাদরাসার সংখ্যা, ছাত্রের সংখ্যা, কিতাবাদির সংখ্যা এবং শিক্ষাসামগ্রীর সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এর জীবনীশক্তি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে আসছে, হৃদয়ের স্পন্দন দূর হয়ে যাচ্ছে। কোন দরদী ও চিন্তাশীল মানুষ এ পথ দিয়ে অতিক্রম করলে তার দম বেরিয়ে আসতে চায়। ব্যাথা-বেদনায় কাতর হয়ে তার মন এ প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে–

خدا تجھے کسی طوفاں سے آشنا کردی

کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں

نخوتے دارند و کبرے چوشھاں

چاکری خواہند از اھل جہاں

"আল্লাহ তা'আলা তোমকে কোন তুফানের সাথে পরিচয় করিয়ে দিন,
কারণ তোমার তরঙ্গমালায় সেই স্পন্দন নেই।
কিতাব থেকে তুমি বিচ্ছিন্ন নও,
তবে কিতাবের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।"

আজ তো মাদরাসার জন্য তুফানের দোয়া করতেও ভয় হয়। বর্তমানে মাদরাসাসমূহে তুফানের কিছু নিদর্শনাবলী দেখা যাচ্ছে। তবে তা হচ্ছে বাইরের ঝড়ো হাওয়া, যা মাদরাসার দেয়ালের সাথে টক্কর খাচ্ছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের আওয়াজ ছাত্রদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে।

বিশ্ব নেতা আজ অনুসারী হয়ে আছে

এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, যে সমস্ত দাওয়াত ও আন্দোলন, সাংগঠনিক তৎপরতা, স্লোগান ও হাঙ্গামা আজকের আধুনিক শিক্ষায়তনে বিবর্জিত ও উচ্ছিষ্ট মনে করা হয়, সেগুলোকে আমাদের মাদরাসাসমূহে পূনর্বাসন করা হচ্ছে। যাদের দুনিয়ার ইমাম, যুগের নেতা এবং মর্যাদার শীর্ষচূড়ায় আরোহণ করার প্রয়োজন ছিল, তারা ধর্মহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুসারী হতে পেরে আজ গর্ববোধ করছে!

کر سکتے تھے جو اپنے زمانہ کی امامت
وہ کنھہ دماغ اپنے زمانہ کے ہیں پیرو

"যুগের নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা যাদের ছিল,
তারাই আজ যামানার গোলামী করছে।"

মাদরাসার সবচে' বড় ফিতনা হচ্ছে ক্রমবর্ধমান হীনম্মন্যতার ব্যাধি, যা ঘূণের ন্যায় কাঠকে খেয়ে শেষ করে ফেলে। কোন প্রতিষ্ঠান যদি হীনম্মন্যতার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তাহলে তার জীবনীশক্তি লোপ পেয়ে যায়, বেঁচে থাকার অধিকার সে হারিয়ে ফেলে।

হীনম্মন্যতা কেন?

প্রিয় বন্ধুগণ! আপনারা আজ এ হীনম্মন্যতার শিকার কেন? সাধারণ লোকদের হীনম্মন্যতায় তাদের ঈমান-আক্বীদা ও আমলের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কিরামের যারা প্রতিনিধি, ইলমে নবূয়তের যারা ধারক-বাহক তারা যদি এ হীনম্মন্যতার ব্যাধিতে আক্রান্ত হোন, তাহলে এটা হবে তাদের নবূয়তের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞতার সুস্পষ্ট দলীল এবং নবূয়তের বিশ্বাস না থাকার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আপনারা তো ঐ সমস্ত মহামণীষীর অনুসারী, যাঁদের ব্যাপারে মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রহ.) যথাযথ বলেছেন :

نخوتے دارند و کبرے جو شہاں
چاکری خواہند از اہل جہاں

"শাহী জাঁকজমক ও মান-মর্যাদার আসনে যারা একদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাদের উত্তরসূরীরাই আজ দুনিয়াদারের নিকট চাকরি ভিক্ষা করছে!"

শেখ সাদী (রহ.)-এর ভাষায় তাঁদের চিত্র এভাবে ফুটে উঠেছে :

سهان بی کله وخسروان بی کمر اند

"তাঁরা ছিলেন মুকুটবিহীন রাজা ও সহায়-সম্বলহীন বাদশাহ।"

আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদাবোধ

আপনাদের নিকট যে মহামূল্যবান দৌলত রয়েছে, দুনিয়াবাসী তা হতে বঞ্চিত। আপনাদের সীনায় ইলমে নবূয়ত সংরক্ষিত রয়েছে, যা দুনিয়ার মানুষ হারিয়ে আজ গভীর অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে; অশান্তি, অস্থিরতা, অরাজকতা, সন্ত্রাস এবং যাবতীয় ফিতনা-ফাসাদে জড়িয়ে পড়েছে।

আপনারা নিজেদের সাদাসিধে জামা, শীর্ণকায় দেহ ও খালি পকেটের দিকে লক্ষ্য করবেন না। আপনাদের সীনার ভিতরে কত মহামূল্যবান মণি-মুক্তা সঞ্চিত রয়েছে তা চিন্তা করুন। পূর্ণিমার সেই উজ্জ্বল চাঁদ আপনাদের হৃদয়ে লুকিয়ে আছে।

بر خود نظر کشاز تہی دامنی مرنج

در سینۂ تو ماہ تمامی نہادہ اند

"নিজের শূন্য আঁচলের দিকে তাকিয়ে তুমি ব্যথিত হয়ো না,

তোমার সীনায় তো লুকিয়ে আছে পূর্ণিমার সেই উজ্জ্বল চাঁদ।"

আপনারা মনে রাখবেন, লজ্জা ও অপমান এগুলো মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। বহির্জগতের সাথে এর সম্পর্ক খুবই কম। নিজেকে হেয় মনে করা মুলত এক মনস্তাত্ত্বিক অবস্থারই নাম। এখান থেকেই হীনম্মন্যতাবোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

মানুষের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, দুর্বলতা ও ইতস্ততাবোধ প্রকৃতপক্ষে আত্মমর্যাদা উপলব্ধির অভাবে হয়ে থাকে। যখন তার মনে সন্দেহ হয় যে, অন্যজন তাকে হেয় মনে করে, মানব সমাজে তার কোন মূল্য নেই, এ ধরনের দ্বিধা ও সন্দেহের কারণে সে নিজেই নিজের উপর জুলুম করে বসে।

স্মরণ রাখবেন, যে নিজেকে হেয় মনে করে, তাকে কেউ সম্মানী বানাতে পারে না। নিজের কাছে নিজের মূল্য না থাকলে কার প্রয়োজন আছে তাকে মূল্যায়ন করার? যে নিজের মনে ঠাঁই পায় না, এ বিশাল দুনিয়ার কোথাও তার ঠাঁই নেই। মন সংকীর্ণ হলে পৃথিবীটাও সংকীর্ণ মনে হবে, আর প্রশস্ত হলে পৃথিবীটাও প্রশস্ত-মনে হবে।

মানুষকে সর্বপ্রথম দেখতে হবে, তার কাছে নিজের কি পরিমাণ মূল্য আছে। সে নিজকে যতটুকু সম্মানী করে? নিজের সাথে নিজের আচরণ কি ধরনের? যে ব্যক্তি নিজকে লাঞ্ছিত, অপমানিত, অসহায়, অকর্মণ্য, নিরর্থক ও অপদার্থ মনে করে, দুনিয়াতে তার সম্মান পাওয়ার আর কোন আশা নেই। এ বাস্তবতাটিকেই দানবীর হাতেম তাঈ তাঁর কবিতায় এভাবে ব্যক্ত করেছেন :

وَنَفْسُكَ اَكْرِمْهَا فَاِنَّكَ ان تهن

عَلَيْكَ فَلَنْ تَلْقَىٰ مِنَ النَّاسِ مُكْرِمًا

"তুমি নিজেকে সম্মান দাও, কারণ নিজকে যদি অপদার্থ,

লাঞ্ছিত মনে কর, তাহলে মানুষের কাছে কোনদিন সম্মান পাবে না।"

বন্ধুগণ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমরা হীন নই। শুধুমাত্র হীনম্মন্যতার ব্যাধিতে আক্রান্ত। আমাদের আত্মপরিচয় না থাকার কারণেই এ ব্যাধির সৃষ্টি হয়েছে। এর সুচিকিৎসা হলো, আমরা কোন মাকামে আছি, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা এবং আমাদের সহায়-সম্বল ও পুঁজির যথাযথ নিরীক্ষণ করা। দুনিয়ার পরিবর্তন ও চিন্তাধারার পরিবর্তন মূলত আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের উপরই নির্ভরশীল। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যেদিন পরিবর্তন হবে, সেদিন দেখবেন দুনিয়াতেও পরিবর্তন ঘটেছে। হীনম্মন্যতার এ ভয়ানক মূর্তি যা আমাদের মন ও মস্তিষ্কের উপর চেপে রয়েছে এবং হৃদয়-মনে সদা ভীতির সঞ্চার করছে, তা একদিন দূরীভূত হয়ে যাবে। কবি যথার্থই বলেছেন :

اور اگر باخبر اپنی شرافت سے ہو

تیری سپہ انس و جن تو ہے امیر جنود

"স্বীয় আত্মমর্যাদার সন্ধান পেলে মনে হবে যে, তুমিই তো প্রধান সেনাপতি, আর মানব-দানব সবই তোমার অধীনস্থ বাহিনী।"

আমাদের প্রাচীন ও সমকালীন ইতিহাসে যাঁরা নিজেদের সার্বিক মান নির্ণয় করতে পেরেছেন এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত দৌলত ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, সারা পৃথিবী তাদের কাছে তুচ্ছ মনে হয়েছে। কোন রাজত্ব তাঁদের খরিদ করতে পারেনি। দুনিয়ার বড় বড় প্রলোভনের সামনে তাঁরা মাথানত করেননি। সহাস্য বদনে তাঁরা সবকিছু প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বলে দিয়েছেন :

برو ایں دام بر مرغ دگر نہ
کہ عنقا را بلند است آشیانہ

"চলে যাও তুমি, এ দামে এ ধরনের কোন পাখি খরিদ করতে পারবে না, এর মূল্য তো আরো অনেক অনেক বেশি।"

যারা নিজেদেরকে স্বার্থের বিনিময়ে বিক্রি করতে পারে, সেসব আত্মভোলা, অসচেতন মানুষের লম্বা লম্বা দাস্তানে মানব সভ্যতার ইতিহাস আজ কলংকিত। কিছু সচেতন, আল্লাহ্ ভীরু এ আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মণীষীর বদৌলতেই মানবতার মান আজও শীর্ষে রয়েছে। জীবনের ইজ্জত আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের কারণেই টিকে আছে।

বন্ধুগণ! মানব জীবনের স্থায়িত্ব ও তার ক্রমধারা টিকিয়ে রাখার জন্যে খাদ্য, বস্ত্র ও জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের যেমন দরকার রয়েছে; তেমনি জীবনের মান-মর্যাদা, গাম্ভীর্য ও মানবতার ইজ্জত টিকিয়ে রাখার জন্য এমন কিছু মহামণীষীর প্রয়োজন যারা জড়বাদী এ দুনিয়ার মাঝে নবূওয়তী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবেন, বস্তুকেন্দ্রিক উপায়-উপকরণের অনীহা প্রকাশ করবেন এবং নিঃসঙ্কোচে তাদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হবে :

أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ-

"তোমরা কি আমাকে এ সমস্ত ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদের সম্পদের তুলনায় অনেক অনেক উত্তম। তোমরাই বরং তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে খুশি হয়ে থাক।"

[সূরা নামল : ৩৬]

যেদিন এ আওয়াজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে এবং সারা দুনিয়া নিলামের বাজারে পরিণত হবে, ঈমান-আমল, বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান কোন না কোন দামে খরিদ করা যাবে, প্রাণী ও জড়বস্তুর ন্যায় মানুষ পণ্যে পরিণত হবে, সেদিন এ দুনিয়া বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাবে। মানবতার মান-মর্যাদা তখন আর কিছুই বাকী থাকবে না।

বর্তমান যুগ-সন্ধিক্ষণে আপনাদের দায়িত্ব মানবতার মর্যাদা ও নবূয়তের সম্মান টিকিয়ে রাখা। একমাত্র আপনারাই এ দায়িত্ব পালন করবেন। অন্য কারো

কাছ থেকে তা আশা করা যায় না। যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উদরপূর্তিকেই সবচেয়ে বড় লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করেছে, তাদের কাছ থেকে এ দায়িত্ব পালনের আশা করা সম্পূর্ণ বৃথা। শুধুমাত্র আপনারাই এ গুরুদায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা রাখেন। আপনাদের পূর্বসুরীগণের মধ্যেই তো ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর মতো আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন আদর্শবান মানুষ অতিবাহিত হয়েছেন। আব্বাসীয় খিলাফত যাঁদেরকে কোনকিছুর বিনিময়ে খরিদ করতে পারেনি। ইমাম গাযযালী (রহ.)-এর মতো সৎ সাহসী ও বলিষ্ঠ হিম্মতের অধিকারী ব্যক্তি অতীত হয়েছেন, যিনি খিলাফতের ইঙ্গিত সত্ত্বেও বাগদাদের নিযামীয়া মাদরাসার প্রধান শিক্ষকের পদ নিতে রাজী হননি। খলীফার পরই যা সবচেয়ে বড় ধর্মীয় সম্মান বলে বিবেচিত হতো, তা তিনি গ্রহণ করেননি। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) সম্রাট জাহাঙ্গীরের সামনে মাথানত করার পরিবর্তে গোয়ালিয়র কারাগারের অন্ধকার কুঠরীকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

আপনাদের পূর্বসূরীগণের মধ্যে আরো রয়েছেন হযরত মির্জা মাযহার জানে জানাঁন (রহ.)। দিল্লীর সম্রাট যাঁর কাছে পয়গাম প্রেরণ করেছিলেন যে, আল্লাহ্ আমাকে এতবড় সালতানাত দান করেছেন, আপনি এর কিছু অংশ গ্রহণ করুন। তখন তিনি বলেছিলেন আল্লাহ্ তা'আলা তো সমগ্র বিশ্ব জাহানকে " مَتَاعٌ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ " তুচ্ছ-সামান্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আর এর একটিমাত্র অংশ আপনার অধিকারে রয়েছে। অতএব, এ থেকে কিছু অংশ গ্রহণ করার জন্য আমি কিভাবে হাত বাড়াতে পারি? একবার নওয়াব আসিফ জাহ তাঁর সামনে মুদ্রা পেশ করলে তিনি তা গ্রহণ করেননি। নওয়াব বললেন, এ মুদ্রাগুলো আপনি গ্রহণ করে অভাবীদের মাঝে বিতরণ করে দিন। তখন তিনি উত্তর দিলেন, দান কিভাবে করতে হয় তা আমার চেয়ে আপনিই ভাল জানেন। এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আপনি নিজেই বন্টন করতে করতে যান। চলার পথেই তা শেষ হয়ে যাবে।

আপনাদের এক পূর্বপুরুষ ছিলেন হযরত শাহ গোলাম আলী সাহেব দেহলবী (রহ.)। টুংকি প্রদেশের গভর্নর নওয়াব মীর খাঁ তাঁর খানকাহতে বাৎসরিক ব্যয় খাতে কিছু টাকা ধার্য করতে চাইলে তাকে উত্তর লিখেন :

ما آبروئے فقر و قناعت نمی بریم
با میر خاں بگوں کہ روزی مقدر است

"দরিদ্রতা থাকা সত্ত্বেও অল্পে তুষ্টির গুণ আমাদের মধ্যে রয়েছে।

মীর খাঁকে বলে দাও যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমাদের রিযিক নির্ধারিত আছে।"

আপনাদের আরেক পূর্বপুরুষ ছিলেন মাওলানা আব্দুর রহীম রায়পুরী (রহ.)। দশ পয়সা বেতনের শিক্ষকতাকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন; কিন্তু বেরেলী কলেজের আড়াইশত টাকা বেতনের অধ্যাপনা করতে রাজি হননি। তিনি প্রফেসরের সম্মানজনক পদকে এ বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে কি উত্তর দিব?

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহ.)-এর ব্যাপারে তো আপনারা জানেন যে, তিনি আলীগড়ের এক ধার্মিক ব্যক্তির কাজ করতেন মাত্র দশ টাকা বেতনে। আম্মা ইন্‌তেকাল করলে আরো দু'টাকা এ থেকে কমিয়ে নেন। এর কারণ তিনি বলেছিলেন যে, প্রতি মাসে আমি দু'টাকা মায়ের পিছনে খরচ করতাম। তার ইনতেকালের পর আমার এটাকা খরচের অতিরিক্ত হয়ে যায়। আমি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দরবারে এ টাকার জবাবদিহী থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই।

আপনাদের পূর্বসুরীগণ নিকট অতীতে কত বড় ত্যাগ ও কুরবানীর নজীর স্থাপন করেছেন। অল্প বেতনে মাদরাসার শিক্ষকতা করেছেন। আর কলেজ-ইউনিভার্সিটির মোটা অংকের বেতনের চাকুরিকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন এবং সীমাহীন ত্যাগ ও কষ্টে জীবন কাটিয়েছেন–

أُولٰئِكَ أٰبَائِيْ فَجِئْنِيْ بِمِثْلِهِمْ يَا جَرِيْرُ الْمَجَامِعُ

"এরূপ ছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষগণ; তোমাদের পক্ষে সম্ভব হলে এমন দৃষ্টান্ত পেশ কর দেখি।"

এ পথ ভোগ-বিলাসের নয়

বন্ধুগণ! আপনারা এরূপ মনে করবেন না যে, যামানার বিবর্তন, প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণের আধিক্য, সাহস ও হিম্মতের দূর্বলতা ইত্যাকার সমকালীন বিষয় সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। যার ফলে আমি আপনাদের কাছে মাওলানা আব্দুর রহীম রায়পুরী (রহ.) ও মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহ.)-এর মত ত্যাগ ও কুরবানীর নজীর স্থাপন করার আহ্বান জানাচ্ছি। তবে একথা অবশ্যই স্মরণ রাখবেন যে, আপনাদের এ পথ নিঃসন্দেহে ত্যাগ ও কুরবানীর পথ, সীমাহীন কষ্ট ও কঠোর সাধনার পথ। এ পথ দুনিয়া উপার্জন ও মান-মর্যাদা লাভের পথ নয়। এ পথে قَدْ كُنْتُ مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا "তোমার কাছে তো আমাদের বড় আশা ছিল"-এর তিরস্কার শুনতেই হবে। আর :

وَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ۔

"আমি তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে সকল উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেদিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। আপনার পালনকর্তার দেয়া রিযিক অনেক উত্তম এবং অধিক স্থায়ী।" [সূরা ত্বাহা : ১৩১]

এর সবক অবশ্যই নিতে হবে। তবে এর পুরস্কার কি হবে, তাও শুনে নিন:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَكَانُوا بِأٰيَاتِنَا يُوْقِنُوْنَ

"ধৈর্যধারণ এবং আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি বিশ্বাস থাকার কারণে আমি তাদেরকে আমার নির্দেশিত পথ পরিচালনায় নেতৃত্বের মসনদে সমাসীন করেছি।"

মাওলানা রূমী (রহ.) এটাকে তাঁর ভাষায় এভাবে ব্যক্ত করেছেন :

معدہ را بگزار سوئے دل خرام

تا کہ بے پردہ ز حق اید سلام

"উদরপূর্তির ভাবনা পরিত্যাগ করে হৃদয়কে বিকশিত করার চেষ্টা কর, মহান প্রভুর পক্ষ থেকে পাবে তুমি শত সহস্র অভিনন্দন।"

যুগের অসহায়ত্ব ও তার চরম পিপাসা

আপনারা যে হীনম্মন্যতার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন, এর একটা কারণ, আত্মমর্যাদাবোধের অভাব। কিছুক্ষণ পূর্বেই আমি তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছি। দ্বিতীয় কারণ হলো, এ দুনিয়ার আবর্তন-বিবর্তন সম্পর্কে আপনাদের কোন ধারণা নেই। আপনারা জানেন না, এ জগত কত অসহায়, তার পিপাসা কত তীব্র। আপনারা তো এ যামানার দিকে ভীত-সন্ত্রস্ত ও লোভনীয় দৃষ্টিতে তাকান। কারণ, তার সাথে আপনাদের কোন পরিচয় নেই। একটু কাছে গেলে উপলব্ধি করতে পারবেন, এ যামানা কি পরিমাণ দেউলিয়া হয়ে আছে। স্বয়ং যামানাই তার দেউলিয়াপনার তীব্রতা উপলব্ধি করতে পেরেছে। তার মুদ্রার জালিয়াতি ধরা পড়েছে। তার সকল দর্শন, মতবাদ ও জীবন ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। সকল স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে।

উলূমে নবূয়তের যে মহান সম্পদ আপনাদের দান করা হয়েছে, হীনম্মন্যতার কারণে তা জনসম্মুখে পেশ করতে আপনারা সংকোচবোধ করেন।

আপনারা মনে করেছেন যে, এ যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান, পলিটিক্স ও অর্থনীতির চরম উন্নতি ঘটেছে; এখানে আমাদের সেই প্রাচীন থিওরী ব্যর্থ। অথচ, বর্তমান যামানা শান্তির তালাশে অস্থির। তাদের নিদ্রা আজ হারাম হয়ে গিয়েছে।

জাতি আজ তৃষ্ণার্ত। তারা এমন কিছু লোকের অপেক্ষায় রয়েছে, যারা তাদের নতুন পথ দেখাবে। রসূলুল্লাহ (সা.)-এর শান্তির পয়গাম শুনাবে এবং ইসলামের চিরন্তন সত্য তাদের সামনে তুলে ধরবে।

همه آهوان صحرا سر خود نهاده بر کف
بامید آں کہ روزے بشکار خواہی آمد

"জঙ্গলের সমস্ত হরিণ ক্ষুধার জ্বালায় মাথায় হাত রেখে বসে আছে
এ আশায় যে, হয়ত একদিন আমাদের কাঙ্ক্ষিত খাবারের আগমন ঘটবে।"

নবূয়তী ইলমই হলো প্রকৃত জীবন পাথেয়

আপনারা যেসব বিষয়কে মামুলি মনে করেন এবং যেসব ব্যাপারে আপনাদের হৃদয়ে তেমন কোন মমত্ববোধ নেই, সেসব বিষয় নিয়ে আমি বড় বড় ডিগ্রীধারীদেরকে মাথা ঘামাতে দেখেছি। তাদের সামনে যখন আমি আম্বিয়ায়ে কিরামের কথা নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করেছি, তখন মনে হলো যেন পাহাড়ের শীর্ষ চূড়া থেকে তাদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে। আর তারা এমনভাবে উৎসাহের সাথে শ্রবণ করছে যেন ইতোপূর্বে তা আর কোনদিন শ্রবণ করেনি।

দুনিয়ার বাজারে দুনিয়াবী সম্পদ এবং সেখানকার তৈরি পণ্য সামগ্রী নিয়ে গেলে, তা প্রত্যাখ্যাত হবেই। তখন আর এ অভিযোগ পেশ করা যাবে না যে, بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا. 'আমাদের পণ্য-সামগ্রী গৃহীত হয়নি।'

দুনিয়া আপনাদের কাছে আশা করছে যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের শান্তির পয়গাম আপনারা তাকে শুনাবেন, চিরন্তন সত্য তার কাছে পেশ করবেন। বিশ্ব জাহান আজকেও তার সামনে মাথা নত করতে প্রস্তুত রয়েছে। যেমন খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকে সীমিত গন্ডির ভেতরে তার সামনে মাথা ঝুঁকিয়েছিল।

এ কথা সত্য যে, আপনাদের কাছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সৌর বিজ্ঞানের মুষ্টিমেয় কিছু পৃষ্ঠা রয়েছে। এর তুলনায় ইউরোপের কাছে রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এক মহাসমুদ্র। একথাও সত্য যে, আপনারা ইউরোপকে গ্রীক দর্শনের থিওরী দ্বারা ভয় দেখাতে পারবেন না। কারণ, তার জীবনীশক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আপনাদের কাছে আম্বিয়ায়ে কিরামের আনীত যে বিদ্যা ভাণ্ডার সংরক্ষিত আছে, তা থেকে ইউরোপ-এশিয়া এখনো বঞ্চিত রয়েছে।

তারা হয়তো আপনার চিন্তা-গবেষণা ও যুক্তি-তর্কের মাঝে কিছুটা হলেও খুঁত বের করতে সক্ষম হবে কিন্তু আম্বিয়ায়ে কিরামের মুজিযাসমূহ নির্ভুল; চিন্তা-গবেষণা ও যুক্তি-তর্কের ঊর্ধ্বে তার স্থান। অতএব, আপনারা এ মূল শক্তি ও প্রকৃত সম্পদ নিয়ে পূর্ণ ইয়াক্বীন ও আস্থার সাথে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন; প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ময়দানে কাউকে দেখতে পাবেন না।

আপনাদের কাছে মানবতার সুমহান পয়গাম, চিরন্তন সত্য ও রবের জ্ঞানের ভাণ্ডার রয়েছে। মহান সত্তার সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে আপনারাও হয়েছেন মহিমান্বিত ও উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত।

জীবনের সাথে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পর্ক এবং এ জন্য আমাদের পূর্বপুরুষগণের প্রচেষ্টা

প্রিয় ভাইয়েরা! আমি পূর্বেই বলেছিলাম যে, আপনাদের একপ্রান্ত নবূয়তে মুহাম্মাদীর সাথে সংযুক্ত। এ কারণে কি কি দায়িত্ব আপনাদের পালন করতে হবে, তার বিস্তারিত আলোচনা এতক্ষণ পর্যন্ত পেশ করা হলো। এ কথাও আমি পূর্বে বলেছিলাম যে, আপনাদের অপর প্রান্ত হলো বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত। এ হিসেবে আপনাদের দায়িত্ব কী, কিরূপ কাজ করলে আপনারা জবাবদিহিতা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবেন, তা এখন আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো।

আম্বিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমে আমাদেরকে যে জ্ঞান ও মূলনীতি দান করা হয়েছে, এতে বিন্দু পরিমাণ সংযোজন-বিয়োজন করা সম্ভব নয়। আমাদের পূর্বপুরুষগণ এতে কোন প্রকার রদবদল হতে দেননি। এ মহামূল্যবান জ্ঞান ভাণ্ডার তার নিজস্ব আকৃতিতে আমাদের পর্যন্ত তাঁরা পৌঁছিয়েছেন। এর সাথে সাথে তাঁরা এ সুমহান জ্ঞান ভাণ্ডারকে বাস্তব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করতে আজীবন মেহনত করেছেন, নিজেদের প্রখর মেধাকে কাজে লাগিয়ে তাকে জীবন্ত, আমলযোগ্য ও অনুকরণীয় প্রমাণিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার বাস্তব সম্মত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার কারণে সমকালীন যুগের উর্বর মস্তিষ্কের লোকজন সহজেই তা গ্রহণ ও হজম করতে সক্ষম হয়। তৎকালীন যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামী রত্ন ভাণ্ডারের মাঝে কোন প্রকার তারতম্য ও বিরোধ সৃষ্টি হয়নি।

সেকালের বুযর্গানে দ্বীন শরীআতের মূলনীতি ও ধর্মীয় মতাদর্শকে তার নিজস্ব আকৃতিতে সংরক্ষণের ব্যাপারে পাহাড়ের ন্যায় মজবুত ও সুদৃঢ় সংকল্পের

অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা এগুলোর ব্যাখ্যা, উপস্থাপনা এমন সাবলীল ও চমৎকার ভাষায় করেছেন যে, রেশমের কোমলতা ও ফুলের আকর্ষণীয়তা এতে বিদ্যমান ছিল। তাদের কর্মতৎপরতায় মূলত হযরত আলী (রা.)-এর সেই প্রজ্ঞাপূর্ণ হিদায়াতের চিত্র ফুটে উঠত :

كَلِّمُوا النَّاسَ عَلٰي قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ أَتُرِيْدُوْنَ اَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُوْلُه

"তোমরা মানুষের সাথে তাদের বুঝবার সামর্থ্য অনুযায়ী কথা বল। তোমরা কি চাও যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)-কে মানুষ মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক?"

এ কারণেই তাঁরা সমকালীন মেধা, বিবেক-বুদ্ধি ও মননশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী শরীআতকে উপস্থাপন করেছেন।

হিজরতের তৃতীয় শতকে বাদশাহ্ মামুনুর রশীদ ও মু'তাসিম বিল্লাহ্র তত্ত্বাবধানে এবং গ্রীক দর্শনের প্রভাবে মুতাযিলা মতবাদ মানুষের মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। জনসাধারণ এটাকেই যুক্তি ও তত্ত্বভিত্তিক মতবাদ বলে ভাবতে থাকে, যামানার ফ্যাশন ও উন্নত চিন্তা-চেতনার ধারক-বাহক মনে করতে থাকে; সে যুগে ইমাম আবুল হাসান আশআরী (রহ.) এ ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা বুলন্দ করেন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা বিশ্বাস, সুন্নাত ও শরীআতকে তাদের পরিভাষা ও বাচনভঙ্গিতে উপস্থাপন করতে লাগলেন। এর ফলে অল্পদিনের মধ্যেই সে মতবাদের অসারতা প্রমাণিত হয় এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মাঝে দ্রুতগতিতে হীনম্মন্যতার যে হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল, তা হঠাৎ থেমে যায়।

আবূ বকর আস সায়রাফী বলেন– "মুতাযিলারা অনেক উঁচু আসনে সমাসীন হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতিরোধ করার জন্যে শায়খ আবুল হাসান আশআরী (রহ.)-কে সৃষ্টি করেন। তিনি তাঁর মেধা, বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তির ভিত্তিতে তা সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ করে দিতে সক্ষম হন।" আর এ সুমহান কীর্তির কারণে আবূ বকর ইসমাঈলীর মত দূরদর্শী ব্যক্তিও তাঁকে উম্মতের একজন মুজাদ্দিদ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

ইমাম আবুল হাসান আশআরী (রহ.)-এর তিরোধানের পর তাঁর চিন্তা-চেতনার অনুসারীগণ এ ধারা অব্যাহত রাখেন। যার ফলে কাযী আবূ বকর বাকেল্লানী (রহ.), শায়খ আবূ ইসহাক ইসফারায়েনী (রহ.)-এর মত তর্কবিদ এবং আল্লামা আবূ ইসহাক সিরাজী ও ইমামুল হারামাইনের মত শিক্ষাবিদ তৈরি হন। তাঁরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব এ দুনিয়াতে

টিকিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেযুগে গ্রীক দর্শনের জ্ঞান-ভাণ্ডার ধীরে ধীরে আরবী ভাষায় স্থানান্তরিত হচ্ছিল এবং দার্শনিকগণ একে বড়ই পূত-পবিত্র ও নির্ভেজাল হিসেবে প্রচার করছিল; যার ফলে তা সত্য-মিথ্যার মানদণ্ডে পরিণত হয়েছিল। এর মোকাবিলায় ইলমে কালাম অত্যন্ত স্থবির ও নির্জীব হয়ে পড়েছিল, অন্ধ অনুকরণের ভূত তাদের উপর চেপে বসেছিল। কালাম শাস্ত্রবিদ আলিমগণ শুধু আশআরী ও মাতুরিদী আকাইদ গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং তা প্রমাণ করার জন্য সেকালের যুক্তি ও দলীলসমূহ ঐ পরিভাষাতে পেশ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। অথচ সমকালীন যুগের চাহিদা অনুযায়ী নতুন যুক্তি, তত্ত্ব ও উপস্থাপনার মাধ্যমে আকাইদসমূহ জনগণের কাছে পেশ করা সময়ের দাবি ছিল।

ইমাম আবুল হাসান আশআরী (রহ.)-এর যুগ ছিল দর্শনশাস্ত্রের শৈশবকাল। তখন মুসলিম বিশ্বে সবেমাত্র তার পরিচয় হতে চলছিল। হিজরী পঞ্চম শতকে গিয়ে তা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয়। তখন মানব জীবনের সাথে তার গাঢ় সম্পর্ক হয়ে যায়। ঐ মুহূর্তে একজন সচেতন, তীক্ষ্ণ মেধা ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী সুমহান ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এমন সংকটময় মুহূর্তে ইমাম গায্যালী (রহ.)-এর মত একজন যুগান্তকারী ও কালজয়ী ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেন। তিনি তাঁর গ্রন্থরাজির মধ্যে ইসলামের আকাইদ ও মূলনীতিকে নতুন আঙ্গিকে, অভিনব পদ্ধতিতে ও অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে হাজারো বিভ্রান্ত, দিশেহারা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে অস্থির মানুষ প্রশান্তির সন্ধান পায়; ঈমান ও ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

তখনকার যুগে ইমাম গায্যালী (রহ.)-এর সুমহান দ্বীনী খিদমতকে যদিও কালাম শাস্ত্রবিদ আলিমগণ কোন মূল্যায়ন করেননি, বরং ইলমে কালামের মতাদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে বিভিন্ন প্রকার অভিযোগ উত্থাপন করতে থাকেন। ফলে, তার জবাবে ইমাম গাযযালী (রহ.) 'ফায়সালুত-তাফাররুকাহ বায়নাল ইসলাম ওয়াল যান্দাকাহ' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। পরবর্তীকালে মুসলিম বিশ্ব তাঁর এ সংস্কারমূলক কীর্তির ভূয়সী প্রশংসা করে।

ইমাম গায্যালী (রহ.) ঈমান-আক্বীদা বিধ্বংসী গ্রীক দর্শনের জবাবদানের জন্য তা গভীরভাবে অধ্যয়ন করার প্রয়োজন অনুভব করেন। তাই তিনি দু'বছর দর্শনশাস্ত্রের উৎস অনুসন্ধানে ব্যয় করেন। তার আক্বীদা-বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিকে খুব ভালভাবে আত্মস্থ করেন যেমনটি তিনি 'আল-মুনকিয মিনাদ-দলাল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি সর্বপ্রথম 'মাকাসিদুল ফালাসাফাহ' এবং এরপর 'তাহাফুতুল ফালাসাফাহ' নামে দু'টি গ্রন্থ রচনা করেন।

কালামশাস্ত্রবিদ আলিমগণ ইসলামের পক্ষ থেকে দর্শনের যে জবাব প্রদান করতেন, তা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। কিন্তু ইমাম গায্যালী (রহ.) 'তাহাফুতুল ফালাসিফা' লিখে দর্শন শাস্ত্রের শীর্ষ মহলে সর্ব প্রথম প্রস্তরাঘাত করেন। পশ্চিমা বিশ্বের ঐতিহাসিক ও দার্শনিকদের ভাষায় বলতে পারি যে, তাঁর এ হামলার প্রভাবে দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি শতাব্দীকাল যাবত নড়বড়ে থাকে। প্রায় নব্বই বছর পর দার্শনিক ইবন রুশদ 'তাহাফাতুত তাহাফূত' লিখে সে হামলার জবাব দানের চেষ্টা করেন।

ইমাম গায্যালী (রহ.)-এর পর দর্শনশাস্ত্রের মূল ভিত্তির উপর আঘাত হানার প্রয়োজন ছিল। উত্তর-প্রতিউত্তর ও অভিযোগের তীর দ্বারা তার প্রাচীর ভেঙ্গে খান খান করে দিয়ে এ সত্য প্রমাণ করার দরকার ছিল যে, শুধুমাত্র অনুমান ও অলীক কল্পনার উপর ভিত্তি করেই এ শাস্ত্রের জন্ম হয়েছে। এর জন্য সুবিস্তর জ্ঞানের অধিকারী, দর্শনশাস্ত্রের তথ্য উদঘাটনকারী একজন গবেষক, পর্যালোচক ও শক্তিশালী লেখকের প্রয়োজন ছিল। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ছিলেন এ কাজে যথোপযুক্ত ব্যক্তি। সর্বদিক দিয়ে তাঁর যোগ্যতা ছিল। তিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে, বিশেষত 'আর-রাদ্দু আলাল-মানতিকিয়্যীন' প্রণয়ন করে দর্শনশাস্ত্রের পুরো কাঠামোকে অসাড় ও ভিত্তিহীন প্রমাণ করেন। তাঁর গবেষণামূলক সে সকল গ্রন্থ আজো মন ও মস্তিষ্কে স্পন্দন সৃষ্টি করে। মানুষের চিন্তা-চেতনাকে প্রখর ও কর্মমূখর করে তুলে।

অপরদিকে ফালসাফা ও ইলমে কালাম মিলে যখন মানুষের মন-মগজে যুক্তি ও বুদ্ধির রাজত্ব বিস্তার করল এবং মুসলিম সমাজে সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড একমাত্র যুক্তিবাদ-এর কুপ্রভাব ছড়িয়ে দিল, তখন এর বিরুদ্ধে মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রহ.) কলম ধরলেন। তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ 'মসনবী শরীফ' মূলত সপ্তম শতাব্দীর যুক্তিবাদের মোকাবিলায় এক প্রতিবাদী গ্রন্থ। এতে তিনি আকাইদ ও ইসলামের মৌলনীতি প্রমাণ করার জন্য নূতন নূতন উদাহরণের মাধ্যমে দলীল পেশ করেছেন, যা একসাথে মন ও মস্তিষ্ক উভয়টিকে প্রভাবান্বিত করে, সকল প্রকার দ্বিধা ও কলুষতা থেকে মুক্ত করে আত্মাকে বিশুদ্ধ করে তোলে। এ কালজয়ী গ্রন্থের প্রভাব আজো এ দুনিয়ায় বিদ্যমান রয়েছে। দার্শনিকদের মন-মগজে তা অব্যর্থ তীরের ন্যায় কাজে করে যাচ্ছে।

হাফিয ইবন তাইমিয়া (রহ.) ও মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রহ.)-এর পর দর্শনশাস্ত্রের এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। ইলমে তাসাওউফ ও আখলাকের সীমানায় তা অনুপ্রবেশ করে এবং রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থাতেও হস্তক্ষেপ শুরু

করে। অতএব, তা প্রতিহত করার জন্য শুধু ইলমে ইলাহিয়াত ও ইলমে কালাম যথাযথ ছিল না; বরং ফালসাফা ও দর্শনশাস্ত্রের সর্বগ্রাসী হামলা দমন করার জন্য এমন সুমহান বিপ্লবী ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল, যার মধ্যে রয়েছে প্রাচীন গ্রীকদর্শনের জ্ঞান, মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারার জ্ঞান, সমাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শনশাস্ত্র, তাসাউফ তথা সর্ববিষয়ে গভীর ও বিশ্লেষণধর্মী জ্ঞান।

এ পরিস্থিতিতে যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)-এর মত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' ও 'ইযালাতুল খিফা' লিখে তিনি ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন, একাডেমিক পরিসরে ইসলামকে অভিনব পদ্ধতিতে জীবন্ত ও গতিশীল ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করেছেন এবং সকলের হৃদয়ে উলামায়ে কিরামের মর্যাদা ফিরিয়ে এনেছেন।

১৭৫৭ সালে ভারত উপমহাদেশে ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তারের পর, নতুন নতুন ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। খ্রিস্টান মিশনারীগণ ইসলামের উপর প্রকাশ্যে আক্রমণ শুরু করে দেয়। উলামায়ে কিরামকে তারা মোকাবিলা করার আহ্বান জানাতে থাকে। এহেন সংকটময় মুহূর্তে পাদ্রীদের যাবতীয় অভিযোগ খণ্ডনের জন্য বাইবেল ও তার ব্যাখ্যা, সংকলনের ইতিহাস এবং খ্রিস্টধর্মের সাথে ইসলামের সংঘাতপূর্ণ বিষয়াবলী গভীরভাবে অধ্যায়ন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এহেন মুহূর্তে হযরত মাওলানা রাহমাতুল্লাহ্ কিরানভী (রহ.) এ ময়দানে বীরদর্পে এগিয়ে আসেন। 'ইযহারুল হক' ও 'ইযালাতুল আওহাম' এর মত গ্রন্থ প্রণয়ন করে খ্রিস্টধর্মের প্রচার-প্রসারে এক দুর্দমনীয় আঘাত হানেন। হিন্দুস্থান থেকে মিসর, তুর্কিস্তান পর্যন্ত কোথাও তাঁর প্রণীত এ গ্রন্থগুলোর কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞগণ আজ পর্যন্ত এগুলোর মোকাবিলা করার সাহস পায়নি।

তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের ছত্রছায়ায় আর্য সমাজও ইসলামের মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাসে আঘাত হানা শুরু করে। পৃথিবীর নতুনত্ব, প্রাচীনত্ব, আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও তাঁর গুণাবলী, হায়াতুন্নবী, কিবলা, পুনরুত্থান এবং এ ধরনের আরো অনেক মাসয়ালার উপর তারা যুক্তিভিত্তিক অভিযোগ পেশ করতে থাকে। আর এগুলো খণ্ডনের জন্য ইলমে কালামের প্রাচীন প্রমাণাদী ও তার উপস্থাপন পদ্ধতি তেমন কার্যকরী ছিল না। হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহ.) এ অভাব পূরণে এগিয়ে আসেন এবং ইলমে কালামের এক নতুন দিগন্তের সূচনা

করেন। অত্যন্ত সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় ছোট ছোট উদাহরণ এবং সহজ ও বোধগম্য প্রমাণাদি দ্বারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কঠিন মাসয়ালার সমাধান পেশ করেন। 'তাকরীরে দিলপজীর', 'হুজ্জাতুল ইসলাম', 'আবে হায়াত' ও 'কেবলা নুমা' গ্রন্থগুলো তাঁর অসাধারণ মেধা, সুরুচি ও সুক্ষ্মদর্শী হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পাঞ্জাব প্রদেশে আরেক ফিতনার জন্ম নেয়। যা ছিল মূলত নবূয়তে মুহাম্মাদীর বিরুদ্ধে এক সুপরিকল্পিত বিদ্রোহ। ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাস ধ্বংস করে এক নতুন নবূয়ত ও ইমামতের প্রাসাদ নির্মাণ করাই ছিল তার লক্ষ্য। এ ফিতনার মোকাবিলায় কয়েকজন দূরদর্শী বিজ্ঞ আলিমেদ্বীন ময়দানে নেমে এলেন। তন্মধ্যে সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গরী (রহ.) ও সাইয়িদ আনোয়ারশাহ কাশ্মীরি (রহ.) বিশেষ কৃতিত্বের সাক্ষর রেখে গিয়েছেন।

যুগের দাবি

উপরোক্ত বিশদ বিবরণ এ জন্য পেশ করা হলো, যাতে আপনারা অনুমান করতে পারেন যে, আমাদের পূর্বসূরী উলামায়ে ইসলাম তাঁদের মেধা, দূরদর্শিতা ও প্রতিভাকে দ্বীনের স্বার্থে কাজে লাগাতে কোন প্রকার ত্রুটি করেননি, যাত্রাপথে কোথাও বিশ্রাম নেননি, যামানার নেতৃত্ব কখনো তাঁদের হাতছাড়া হয়ে যায়নি; যুগের বিবর্তন ও কালের গতিধারা অনুধাবন করতে কখনো তাঁরা ত্রুটি করেননি। যুগ চাহিদা অনুসারে দ্বীনের স্বার্থে যে পদ্ধতি অবলম্বন করার দরকার ছিল, নিঃসঙ্কোচে তাঁরা তা অবলম্বন করেছেন। সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে থেকে তাঁরা ইসলামকে সংরক্ষণ করার অঙ্গীকার করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন দল বা গোষ্ঠীর চিন্তাধারা অনুসরণ করে তাঁরা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেননি।

ভারত ও মিসরে যখন ইসলামের উপর ভাষা-সাহিত্য-ইতিহাস ও শিক্ষা-সংস্কৃতির মাধ্যমে হামলা শুরু হলো এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লেখকগণ সত্যনিষ্ঠ ও আস্থাভাজন মুসলিম মণীষীগণের উপর নানা ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করে ইসলামের অবকাঠামো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে চাইলো তখন উলামায়ে কিরামের মধ্য হতে একদল বিদগ্ধ লেখক, সাহিত্যিক ও কলম সৈনিক এদের মুকাবিলাতে সামনে অগ্রসর হন এবং তাঁরা ঐ সকল বিষয়ে কলম ধরেন। তাঁদের রচনাগুলো ইসলামী বিষয়ের পাশাপাশি উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের রত্ন ভাণ্ডার হিসেবে আজো সংরক্ষিত আছে। শত-সহস্র আধুনিক শিক্ষিত লোক তাঁদের রচিত গ্রন্থগুলো পাঠ

করে ঈমানের সন্ধান পেয়েছেন। তাদের মানসিক প্রশান্তি লাভ হয়েছে ও হৃদয়ের যাবতীয় অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা বিদূরীত হয়েছে এবং ইসলামের সাথে আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মাওলানা শিবলী নুমানীর 'আল-ফারূক' 'আল-জিযিয়াতু ফিল ইসলাম' ও 'কুতুবখানায়ে ইস্কান্দারিয়া' অত্যন্ত অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে।

পাঠ্য তালিকায় সংযোজন-বিয়োজন

স্বয়ং আপনাদের পাঠ্যপুস্তক এ বাস্তবতার সাক্ষ্য বহন করে যে, আমাদের দূরদর্শী উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন প্রয়োজনকে মেনে নিতে এবং যুগ সমস্যা-সমাধানে অতি জরুরী ও কল্যাণকর যে কোন বস্তুকে গ্রহণ করতে তাঁরা কখনও পিছপা হননি।

আপনাদের এ পাঠ্য তালিকা বিভিন্ন যুগের নানা পরিবর্তন, বিভিন্ন মতাদর্শ ও ইলমী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করছে। শুধুমাত্র বিগত শতাব্দীতে সামান্য কিছু বিষয় ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অথচ এ যুগেই রাজনীতির পরিবর্তন ও মানুষের চিন্তা-চেতনা ও মন-মস্তিষ্কের বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত পাঠ্য তালিকায় বৈধ ও জরুরী সংস্কার সাধনের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ও সময়ের বড় দাবি ছিল।

ধর্মীয় নেতৃত্বদানের জন্য বহুমুখী যোগ্যতার প্রয়োজন

প্রিয় তালিবে ইলমগণ বর্তমানে বৈপ্লবিক যুগে ধর্মীয় নেতৃত্ব প্রদান ও ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন এবং এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বতা প্রতিষ্ঠার জন্য শুধু তার আলোচনা করা বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেশ করাই যথেষ্ট নয়; বরং এর জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি ও বহুমুখী প্রতিভার প্রয়োজন। আপনারা ইসলামের বীর সিপাহী। জীবন-সংগ্রামে জয়ী হতে আপনারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সেনা ছাউনীতে যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, তাদের জন্য নতুন-পুরাতন অস্ত্র ও যুদ্ধকৌশল নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া বড়ই ভয়ংকর ও বিপদজনক বিষয়। সিপাহীর কাছে অস্ত্রের নতুনত্ব ও প্রাচীনত্ব বলতে কিছু নেই। সে তো শুধু এ বিষয়টি নিরীক্ষণ করবে যে, যুদ্ধের ময়দানে কোন ধরনের অস্ত্র কার্যকরী হবে। আর কিরূপ রণকৌশল অবলম্বন করলে বিজয় ছিনিয়ে আনা যাবে। সিপাহীর জন্য অস্ত্রবিশেষের সাথে শত্রুতা পোষণ করা বা মিত্রতা দেখানোর কোনই অবকাশ নেই। সুনির্দিষ্ট কোন রণকৌশলের সাথেও তার সম্পর্ক রাখার সুযোগ নেই। তাকে তো সব ধরনের প্রয়োজনীয় অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বীরদর্পে ময়দানে অবতীর্ণ হতে হবে।

আরবের এক কবি অনেক আগেই বলে দিয়েছেন :

كُلُّ امْرِئٍ يَسْعَى إِلَى يَوْمِ الْهِيَاجِ بِمَا اسْتَعَدَّا

"যে যা প্রস্তুত করেছ, তা নিয়েই রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়।"

নতুন মতাদর্শ সম্পর্কে গভীর ও বিশ্লেষণধর্মী জ্ঞানের প্রয়োজন

বন্ধুগণ! আপনাদেরকে সাম্প্রতিককালের মতাদর্শ, আন্দোলন, বিপ্লব ও ফিতনা সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞানার্জন করতে হবে। তবে অপরিপক্ক ও স্বল্পজ্ঞান অজ্ঞতার চেয়ে বেশি ক্ষতিকর। আজ আমাদের মাদরাসাসমূহে ফ্যাশন রূপে অনেক দর্শন, মতবাদ ও আন্দোলনের নাম নেয়া হয়। অথচ খোঁজ নিলে দেখা যাবে, সে সম্পর্কে তাদের কাছে ন্যূনতম জ্ঞানও নেই; গবেষণা ও বিশ্লেষণধর্মী অধ্যয়ন তো অনেক দুরের কথা, এ বিষয়ে মোটামুটি ধারণাও নেই। বর্তমানে গবেষণা ও বিশ্লেষণধর্মী অধ্যয়ন করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা অত্যন্ত জরুরী। এ কাজটি কঠিন মনে হলেও এর প্রয়োজন অনেক। মাদরাসার পক্ষ থেকে সুশৃঙ্খলভাবে তা অধ্যয়ন করার ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করে হলেও এটিকে অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে।

নতুন অধ্যয়নের সংকট ও দায়িত্ব

আমাদের মাদরাসাসমূহে নিত্য-নতুন অধ্যয়নের পরিধি ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছে। তবে আমার দুঃখ হয় এ কারণে যে, সে অধ্যয়নে নেই কোন গভীরতা ও ভারসাম্যতা। আমি সাধারণ জ্ঞানার্জনে ছাত্রদের সবচেয়ে বেশি উৎসাহ প্রদান করে থাকি। তবে আপনারা জেনে রাখুন, নিঃসঙ্কোচে আমি বলছি, এ কাজটিকে যত সহজ মনে করা হয়, তা এত সহজ নয়। এর জন্য গ্রন্থ নির্বাচন, বিন্যাস এবং একজন অভিজ্ঞ পরামর্শদাতার প্রয়োজন। তবে এর পূর্বে নিজের ধ্যান-ধারণা ও মননশীলতা সঠিকভাবে যাচাই করে নিতে হবে। অধ্যয়নের পর লব্ধ জ্ঞানকে বিন্যস্ত করতে হবে এবং সঠিক স্থানে তা প্রয়োগ করতে হবে।

সুষ্ঠ ও নিয়মতান্ত্রিক তালিম-তরবিয়ত পেয়ে যদি কেউ তৈরি হয়ে যায়, তাহলে সে সব ধরনের অধ্যয়ন থেকে উপকৃত হতে পারবে। শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, সাধারণ জ্ঞান এমনকি অনেক অপ্রাসঙ্গিক বিষয় দ্বারা দ্বীনের এমন খিদমত ও মহৎ কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হবে; যা অনেক সময় মৌলিক বিষয় দ্বারাও করা যায় না। আর তখন আল-কুরআনের এ সত্যটি ফুটে উঠবে :

بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ۔

"রক্ত ও গোবরের মধ্য থেকে খাঁটি ও তৃপ্তিদায়ক দুধ নির্গত হয়ে আসে।"

[সূরা নাহল : ৬৬]

আর যদি এরূপ না হয়; ধর্মীয় নীতিমালা ও তার মৌলিক বিষয়সমূহ মন ও মস্তিষ্কে শক্তিশালী প্রভাব সৃষ্টি করতে না পারে; বরং রুচিহীন ও বক্র মানসিকতা বিরাজ করে, তাহলে বিভ্রান্তি কখনো দূর হবে না, সঠিক জ্ঞানার্জন করা সম্ভব হয়ে উঠবে না,

ہر جہ کرد علتی علت شود۔

"যেখানে হাত দেয় সেখান থেকেই ভ্রান্তি বেরিয়ে আসে।"

মাতৃভাষা ও সাহিত্যের সাথে সম্পর্ক

আমি এ সুযোগে আপনাদেরকে আরো দু'টি বাস্তবতার দিকে নিয়ে যেতে চাই। প্রথমত কোন দেশে দ্বীনী খিদমত, তার প্রচার-প্রসার এবং চলমান জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে হলে সেখানকার ভাষা ও সাহিত্যের সাথে পরিচ্ছন্ন সম্পর্ক রাখতে হবে, সুস্থ মস্তিষ্ক ও সুরুচির অধিকারী হতে হবে, সঠিক মান-সম্পন্ন ও জীবন্ত ভাষায় লেখা ও বলার যোগ্যতা থাকতে হবে। আর তখনই দ্বীনের দাওয়াত সে দেশে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে যখন তার মাঝে দিলের অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা বিরাজমান থাকে।

একথা সর্বজন স্বীকৃত ও মনস্তাত্ত্বিক যে, আল্লাহ্ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কিরামকে পর্যন্ত স্বজাতির সামনে কথা বলার জন্য এবং তাদের দিল ও দেমাগকে প্রভাবিত করার জন্য প্রাঞ্জল ও মধুর ভাষায় তাদের মনোভাব ব্যক্ত করার অসাধারণ ক্ষমতা দান করেছিলেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে :

اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ۔

"নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে আরবী ভাষায় নাযিল করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার।" [সূরা যুখরুফ : ৩]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ

"আমি সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় নাযিল করেছি।" [সূরা শু'আরা : ১৯৫]

আরো ইরশাদ হচ্ছে :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ

"আমি প্রত্যেক রসূলকে তার স্বজাতির ভাষা দিয়ে প্রেরণ করেছি।"

[সূরা ইব্রাহীম : ৪]

চিন্তাশীল, গবেষক ও তত্ত্বজ্ঞানী উলামায়ে কিরাম মনে করেন যে, স্বজাতির ভাষা বলতে শুধুমাত্র উক্ত ভাষা বুঝা ও তাদেরকে বুঝানোর যোগ্যতা– এর নাম নয়; বরং যুগের সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্যের মানদণ্ডে উন্নীত ভাষাকেই, বরং তাতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকে বুঝানো হয়েছে। এর প্রমাণ হলো যে, আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে لتبين "যেন আপনি সুস্পষ্টভাবে তাদের সামনে ব্যক্ত করতে পারেন।" অন্যদিকে রসূলে করীম (সা.) বলেছেন أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ অর্থাৎ "আমি সর্বোৎকৃষ্ট আরবী ভাষাজ্ঞানের অধিকারী।"

আপনারা জানেন, ইসলামের ইতিহাসে যারা সংস্কার ও সংশোধনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন এবং মুসলমানদের চিন্তা-চেতনায় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন; তাঁরা সাধারণত ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন। শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর উপদেশবাণীর রত্ন-ভাণ্ডার ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর মাকতুবাতসমূহের সাহিত্যগত মান, সাবলীলতা, প্রাঞ্জলতা ও মাধুর্যপূর্ণ ভাষা আবুল ফযল ফয়জীর রচনা সামগ্রীকেও হার মানিয়েছে। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (রহ.)-এর 'হুজ্জাতুল্লাহি বালেগাহ' আরবী সাহিত্যে এমন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যে, 'মুকাদ্দামায়ে ইবন খালদুন'-এর পর পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এর কোন নযীর পাওয়া যায় না। ফারসী ভাষাতেও শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (রহ.) যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর রচিত 'ইযালাতুল খাফা' কিতাবের কিছু কিছু অংশ ফারসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নমুনার স্বাক্ষর বহন করে।

এতো হলো তখনকার কথা, যখন আরবী, ফারসী এদেশের মুসলমানদের ভাষা ছিল। পরবর্তীতে উর্দু ভাষা চালু হওয়ার পর, স্বয়ং হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (রহ.)-এর সাহেবযাদাগণ সে ভাষাতেই সর্বপ্রথম কলম ধরেন এবং গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু করেন। শাহ্ আব্দুল কাদের (রহ.) কর্তৃক কুরআনুল কারীমের অনুবাদ দিল্লীর ভাষা শৈলীর সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ভাষার সৌন্দর্য ও নির্ভরযোগ্য কারণে তা ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে উন্নত মর্যাদা পেয়েছে।

হযরত কাসেম নানুতুবী (রহ.)-এর গ্রন্থগুলোতে এমন সাবলীল ও মাধুর্যপূর্ণ ভাষা স্থান পেয়েছে, যার ফলে জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলো সহজে অনুধাবন করতে তেমন বেগ পেতে হয় না।

এদেশে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত উলামায়ে কিরামই ভাষা ও সাহিত্যে নেতৃত্ব দান করেছেন। সাহিত্যের পথিকৃৎ হিসেবে তাঁরাই পরিচিত ছিলেন। খাজা আলতাফ হুসাইন আলী, মৌলবী নযীর আহমাদ দেহলভী, মাওলানা শিবলী নুমানী প্রমুখ উলামায়ে কিরাম ছিলেন উর্দু সাহিত্যের প্রখ্যাত স্থপতি। তাঁদের সূক্ষ্ম রুচিবোধ, উন্নত মানসিকতা এবং রচনা সামগ্রীর এমন মূল্যবান রত্ন-ভাণ্ডার রয়েছে, যা উর্দু ভাষায় উজ্জ্বল নমুনা হয়ে আছে। মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী (রহ.) ও দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার মহাপরিচালক মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাই (রহ.) রচিত গ্রন্থরাজি উর্দু গদ্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ এবং ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা ও মাধুর্যপূর্ণ উপস্থাপনার অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত।

মাওলানা সাইয়িদ সুলায়মান নদভী (রহ.) তাঁর তথ্যবহুল আলোচনা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধমালা দ্বারা উর্দুকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থরাজিকে আজো ভাষা ও সাহিত্যের মাপকাঠি মনে করা হয়। মাওলানা আবুল কালাম আযাদের রচনা সামগ্রী উর্দু ভাষায় নতুন শক্তি যুগিয়েছে এবং নতুন বর্ণনাভঙ্গি শিক্ষা দিয়েছে। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'আল-হেলাল' পত্রিকার যাদুময় বর্ণনা পুরো হিন্দুস্থানে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এখনো সাহিত্যাঙ্গনে তার এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

উলামায়ে কিরামের জাগ্রত মস্তিস্ক ও যুগ-সচেতনতার ফলশ্রুতিতে তাদেরকে কখনোই এদেশের উন্নতি, অগ্রগতি ও জাতীয় চাহিদা থেকে বিচ্ছিন্ন বা অবচেতন বলে অপবাদ দেয়া যায় না। তাঁরা তো এদেশের মাটি ও মানুষ থেকে আলাদা থাকার কোন প্রচেষ্টা চালাননি। অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের মত যুগোপযোগী পদক্ষেপ নিতে তাঁরা কখনো পিছিয়ে থাকেননি। বরং দ্বীনের দাওয়াত ও ইসলামের পয়গাম পৌঁছাতে দেশের প্রচলিত ও সাহিত্যাঙ্গনে প্রভাব সৃষ্টিকারী ভাষা ব্যবহার করেছেন।

সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো, তাঁদের নীতিকে আঁকড়ে ধরা এবং এ পূত-পবিত্র উত্তরাধিকারের যথাযথ সংরক্ষণ করা। আমরা যদি দ্বীনের কার্যকরী খিদমত করতে চাই, নিজেদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি সর্বমহলে পৌঁছে দিতে চাই, তাহলে আমাদের বক্তব্য ও লেখনিতে সাবলীল ও মাধুর্যপূর্ণ ভাষা

এবং আধুনিক ভাষাশৈলী ব্যবহার করতে হবে। আপনাদের বক্তৃতা ও রচনা সামগ্রী সমসাময়িক সাহিত্যের মানদন্ডে উন্নীত করতে হবে। আর তা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ ও বুযর্গানে দ্বীনের আদর্শের পরিপন্থী নয়; বরং তা দ্বীনি হিকমতের মৌলিক দাবি।

আরবী ভাষায় দক্ষতা

সাম্প্রতিককালে আরবী ভাষা একটি জীবন্ত ও শক্তিশালী ভাষা। আরব বিশ্বে তা এখন উন্নতি-অগ্রগতির শীর্ষস্থান দখল করে আছে। রচনা-গ্রন্থনা, বক্তৃতা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, দর্শন, আইন তথা সর্বস্তরে আরবী ভাষায় প্রচলন রয়েছে।

আমাদের দ্বীনী মাদরাসাগুলোতে একটি ভুল ধারণা জন্ম নিয়েছে যে, তাফসীর, হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রের কিতাবগুলো প্রাচীন আরবী ভাষাতে সীমাবদ্ধ; বর্তমানে তার কোন ব্যবহার নেই। আধুনিক আরবী ভাষা নামে সম্পূর্ণ একটি নতুন ভাষার জন্ম হয়েছে, যার অধিকাংশ শব্দই ইংরেজী ও ফারসী ভাষা থেকে উদ্ভূত।

এ ভুল ধারণার ফলে আমাদের অনেক আলিম ও তালেবে ইলমের হৃদয়ে আরবী ভাষার প্রতি চরম অনীহা ও হতাশাবোধ জন্ম নিয়েছে। আপনারা যদি আমাকে বিশ্বাস করেন, তাহলে অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করছি যে, আধুনিক আরবী ভাষার অস্তিত্ব বলতে কোনকিছুই নেই। মধ্যপ্রাচ্যসহ সারা আরব মুলুকে একাডেমিক পর্যায়ে এবং জ্ঞানী-গুণী ও বিজ্ঞ মহলে যে ভাষার প্রচলন রয়েছে, তা কুরআন-হাদীস, জাহিলিয়াত ও ইসলামী যুগের খুব নিকটবর্তী। নতুন প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও তারা সেই প্রাচীন যুগে প্রচলিত ভাষা ও কুরআন-হাদীসের রত্ন-ভাণ্ডার থেকে উদ্ভাবন করে শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এ বিস্ময়কর কাজের জন্য তাঁরা হাজারো বার মুবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য।

মিসরে নেপোলিয়ানের হামলার পর পাশ্চাত্য সমাজের যে সমস্ত শব্দ আরবী ভাষায় প্রবেশ করেছে, তা এক এক করে সবগুলোকে বাদ দেয়া হয়েছে এবং এ স্থলে আরবী শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে আরব দেশসমূহের ভাষা, সাহিত্য ও সাংবাদিকতা উন্নতির শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ফলে, এ ময়দানে কাজ করতে হলে এখন অনেক প্রস্তুতি ও কঠিন সাধনার প্রয়োজন রয়েছে।

আমাদের মাদরাসাসমূহে যে পদ্ধতিতে আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, তা দ্বারা আরব বিশ্বে একাডেমিক কোন খিদমত করা বা দাওয়াত ও

তাবলীগের দায়িত্ব সম্পাদন করা সম্ভব নয়। আরব দেশসমূহে দ্বীনী দাওয়াত পরিচালনা করতে হলে এবং হিন্দুস্থানের দ্বীনি কার্যক্রমসমূহের পরিচয় তাদের সামনে তুলে ধরতে হলে ব্যাপকভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। কারণ, হিন্দুস্থান আরব বিশ্ব হতে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না।

বিশ্ব রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। আর তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রত্যেক মুসলমানের দৃষ্টিতে তা এখন বিশ্বের হৃৎপিণ্ড ও কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং, মধ্যপ্রাচ্যের সাথে যদি উলামায়ে কিরাম সুসম্পর্ক বজায় না রাখেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান না করেন, তাহলে তা নিজেদের জন্য এবং এ দেশের জন্য অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। অতএব, আরবী চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের মাদরাসাসমূহের বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

ভাষা ও সাহিত্য জীবন্ত ও গতিশীল বিষয়। এ ব্যাপারে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সামান্যতম দুর্বলতা থাকলে দীর্ঘকাল সেই ক্ষতির খেসারত বরদাশত করতে হবে।

সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাসের হিফাজত

বন্ধুগণ! আমি আপনাদের অনেক সময় নিয়েছি। তবে–

لذیذ بود حکایت دراز گفتم

"ঘটনা ছিল মাধুর্যপূর্ণ, তাই কথা দীর্ঘ করলাম।"

এখন আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বে, সর্বশেষ একটি কথা বলতে চাই। তবে কথাটি সর্বশেষে হলেও তার গুরুত্ব কোন দিক দিয়ে কম নয়। তা হলো, আমাদের পূর্বসুরী উলামায়ে কিরামের সবচেয়ে বড় অবদান হলো, তাঁরা মুসলমানদের দ্বীনী মর্যাদাবোধ ও ধর্মীয় অনুভূতি সংরক্ষণ করেছেন। যুগের কোন ফিতনার সম্মুখে তাঁরা মাথানত করেননি এবং অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করার ব্যাপারে কোন প্রকার দূর্বলতা ও অলসতা প্রদর্শন করেননি। আপনাদের পূর্বসুরীদের মধ্যে শাহ্ মুহাম্মাদ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) ও রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী (রহ.)-এর দিকে তাকিয়ে দেখুন। দুনিয়ার জীবনে তাঁরা সবকিছু মেনে নিতে পারতেন কিন্তু তাঁরা বিদ'আত ও কুসংস্কারকে কখনো মেনে নিতে পারেননি। পাহাড়সম দৃঢ়তা নিয়ে যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁরা আজীবন লড়াই করেছেন।

ইংরেজ শাসনামলে যখন এদেশে পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি ও নাস্তিক্যবাদী ধ্যান-ধারণার বন্যা বইতে শুরু করলো, তখন তাঁরা নিজস্ব মতাদর্শের উপর পাহাড়ের মত অবিচল ছিলেন; তা থেকে সামান্যতম বিচ্যুত হননি। আপনাদের পূর্বসুরী উলামায়ে কিরাম শরীআতের ব্যাপারে অত্যন্ত দূরদর্শিতা ও আত্মমর্যাদার পরিচয় দান করেছেন, যার ফলে তাঁরা শেষ পর্যন্ত কোন বিদ'আতের বৈধতার ফতওয়া দান করেননি।

ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব তাঁরা পালন করেছেন; এতে সামান্যতম সংযোজন-বিয়োজন তাঁরা মেনে নেননি। তাঁদের দূরদর্শিতার কারণে কোন বিদ'আত ইসলামের মুলনীতিতে প্রবেশ করার সুযোগ পায়নি। তাঁরা মানুষের ঘৃণা, তিরস্কার, বয়কট, কুফরের ফতওয়া এবং যাবতীয় জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করেছেন, তবুও নিজস্ব মতাদর্শকে কখনো ত্যাগ করেননি। এর ফলে লক্ষ লক্ষ মুসলমান আজ বিদ'আতের পরশ থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদা-বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছে। আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীন ও শরীআতের অতন্দ্র প্রহরী বুযর্গানে দ্বীনের রূহকে শীতল করুন এবং উম্মতের পক্ষ হতে তাঁদের মেহনতের উত্তম বিনিময় দান করুন।

آسماں ان کی لحد پر شبنم افشانی کرے
سبز ہے نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

"আকাশ তাদের কবরগাহে রহমতের বারি বর্ষণ করুক।
সবুজ গম্বুজ তাদের গৃহের হিফাযত করুক।"

আজ আমরা ঐ সমস্ত বুযর্গানে দ্বীনের অর্ন্তদৃষ্টি, দূরদর্শিতা ও ধর্মীয় জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করতে পারছি। তাঁরা নিজেদের দায়িত্ব অত্যন্ত সুদক্ষতা ও নিপুণতার সাথে পালন করেছেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ۔

"মুমিনদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যাঁরা আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা বাস্তবায়ন করেছে; কেউ জীবন দিয়েছে আর কেউ তার প্রতীক্ষায় রয়েছে। আর তাঁদের মধ্যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আসেনি।" [সূরা আহযাব : ২৩]

আমি আপনাদের কাছে একথা বলে যেতে চাই যে, এ হলো আপনাদের প্রিয় ও মাহবূব সম্পদ। তাঁরা তো নিজেদের জানকে ঢাল বানিয়ে ইসলামের এ বাগিচা সংরক্ষণ করেছেন; হৃদয়ের তপ্ত খুন প্রবাহিত করে এর বৃক্ষরাজিতে সিঞ্চন করেছেন এবং তাঁরা আমাদেরকে শিক্ষাদান করেছেন যে, ইসলামের এ বাগিচা সংরক্ষণ এভাবে করতে হয়।

آغشتہ ایم ہر سر خارے بخون دل
قانون باغبانیٔ صحرا نوشتہ ایم

"কাঁটা বনে হৃদয়ের লহু প্রবাহিত করে লিখে গেলাম
মরুর বুকে ফুল ফোটাবার রীতি।"

ইসলামের এ সম্পদ আজীবন আমাদের বক্ষে ধারণ করে রাখতে হবে এবং এটাকে সবচে' মূল্যবান সম্পদ মনে করতে হবে।

আপনাদের কাছে আমার হৃদয়ের বন্ধুসুলভ অভিযোগ হলো, আপনারা আকাবিরের সে আদর্শ থেকে ধীরে ধীরে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছেন– আপনাদের উচিত ছিল, তাঁদের প্রতিভা ও চেতনাকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা, তাঁদের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণেই তো আজ আপনারা অনেক মানুষের কাছে ঘৃণিত ও অবাঞ্ছিত হয়ে আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনাদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের নাম ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কে অবহিত নন। আপনারা কতজন মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর জীবন বৃত্তান্ত ও অবদান সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন? 'সীরাতে মুসতাকীম' ও 'তাকবিয়াতুল ঈমান' কতজন পড়েছেন ? তাওহীদ ও সুন্নাতের সঠিক পরিচয় আপনাদের মধ্যে কতজন তুলে ধরতে পারবেন?

আপনাদের পূর্বসূরী বুযর্গানেদ্বীন তো বলতে পারতেন যে, আইয়ামে জাহেলিয়াতে ঈমানের অর্থ কি ছিল? কুরআনে কারীম তাদেরকে কেন মুশরিক বলেছে ? তাওহীদের স্তর, শিরকের অর্থ, বিদআতের মর্ম ও তার ক্ষতি সম্পর্কে তারা তো যথেষ্ট প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন।

আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত এ সমস্ত বিষয়ে একেবারেই জ্ঞান রাখেন না।

আধুনিক যুগের ফিতনা

একথা তো সত্য যে, বর্তমান দুনিয়াতে নিত্য-নতুন ফিতনার আবির্ভাব হচ্ছে। অভিনব রূপ নিয়ে প্রাচীন জাহিলিয়াত আত্মপ্রকাশ করছে। আগেকার

যুগে বিদ'আত পর্যন্ত ফিতনা সীমাবদ্ধ থাকলেও এখন তা প্রকাশ্যে মূর্তিপূজার রূপ নিচ্ছে।

বর্তমান সময়ের এ সকল ফিতনা আমাদের ধর্মীয় চেতনা, আমাদের দ্বীনি মূল্যবোধ ও আমাদের আক্বীদা-বিশ্বাসের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। এখন দেখতে হবে, যারা বিদ'আত ও প্রচলিত কুসংস্কার বরদাশত করতে পারেননি, তাঁরা এ সমস্ত প্রতিমা সংস্কৃতি কিভাবে মেনে নিবেন? এ ব্যাপারে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপদ্ধতি কি হবে?

আমরা আমাদের পুর্বসূরীদের ধর্মীয় চেতনা ও আপোসহীন ইসলামী মূল্যবোধ স্বীকার করি। সৃষ্টি ও স্রষ্টার সামনে একথার সাক্ষ্য দিতে কোন প্রকার কুণ্ঠাবোধ করব না যে, তাঁরা বাতিল শক্তির সামনে কখনো মাথানত করেননি, আত্মসমর্পণ করেননি। এখন দেখতে হবে, আমাদের পরবর্তী বংশধরগণ আমাদের সম্পর্কে কি মন্তব্য করে এবং ইতিহাস কিভাবে আমাদেরকে স্মরণ করে।

আধুনিক যুগের দায়িত্ব

বন্ধুগণ! মহান আল্লাহ্ তা'আলা যে যুগের জন্য আমাদেরকে নির্বাচন করেছেন, তার প্রতি বিরাট যিম্মাদারী রয়েছে। সাথে সাথে তার মর্যাদা ও বিনিময়ও রয়েছে অনেক বেশি। দায়িত্বে অবহেলা করা ও পলায়নপর মনোবৃত্তি রাখা পৌরুষসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাজ নয়।

অতএব, জীবনের অবশিষ্ট সময়টুকু আপনারা মূল্যায়ন করুন। যামানার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদেরকে যোগ্যতম মুরুব্বী এবং দয়ালু উস্তাদ নসীব করেছেন। দ্বীনী পরিবেশ ও খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠানে এনেছেন। সুতরাং, যামানার নাযুকতা ও দায়িত্বের ব্যাপকতা উপলব্ধি করুন। নিজেকে কর্মক্ষম ও প্রাণবন্ত করে গড়ে তুলুন। জাতি আপনাদেরকে মূল্যায়ন করবে।

غافل منشیں نہ وقت بازیست

وقت ہنر است وکار سازیست

"আলস হয়ে বসে থেকো না, সময় তো ফিরবার নয়,

সময় হচ্ছে গতিশীল, তাকে মূল্যায়ন করলেই পাবে তুমি জ্ঞানের আধার।"

আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও তার প্রতিরোধ

(প্রবন্ধটি ১৯৭২ সালের ১২ আগস্ট দারুল উলূম দেওবন্দের দারুল হাদীসে মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ রহমানী আমীরে শরীয়ত বিহার-এর এক মাহফিলের সভাপতিত্বে ছাত্রদের এক সভায় পাঠ করা হয়। পরে তা মজলিসে তাহকীকাত থেকে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়)।

দীর্ঘ দিনের মুহব্বতপূর্ণ সুসম্পর্ক

দারুল উলূম দেওবন্দের ছাত্রদের সামনে কিছু আলোচনা করা যেমন ইজ্জত ও সম্মানের বিষয়, তেমনি যিম্মাদারী ও দায়িত্ব সচেতনতারও বিষয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা ইনিস্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে মাদরাসাসমূহতে বয়ান বক্তৃতা করার সুযোগ হয়েছে আমার কিন্তু নিঃসংকোচে বলতে হয় যে, আপনাদের সামনে কোনকিছু বলতে হলে অনেকটা যিম্মাদারী বোধ নিয়ে বলতে হচ্ছে। আপনারা আমাকে যে ইজ্জত-সম্মান প্রদর্শন করেছেন এবং আমার উপর যে আস্থা রেখেছেন, আমি তাকে মূল্যায়ন করি। এ জন্য আমি আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদাবনত হয়ে শুকরিয়া আদায় করি। কারণ, এক সময় আমি এখানে তালেবে ইলম হয়ে এসেছিলাম এবং এটাকে আমি নিজের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় মনে করি। আর আজ আমাকে এখানে বক্তৃতা করার সম্মান প্রদান করা হচ্ছে। হয়ত এ পূণ্যভুমি এখনো আমাকে ভোলেনি। আমি এ সৌভাগ্য ও তাওফীকের কারণে আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদা করে শুকরিয়া আদায় করছি। কারণ, এক সময় আমি হযরত শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) এর জীবদ্দশায় তালেবে ইলম ও ভিখারী হয়ে হাযির হয়েছিলাম এবং তাঁর সামনে ছাত্র হয়ে নতজানু হয়ে বসার তাওফীক লাভ করেছিলাম। এ সকল বিষয়কে আমি নিজের জন্য সৌভাগ্যের বস্তু মনে করি এবং এর কারণে আল্লাহ্‌র দরবারে বড় আশা রাখি।

আমি এ নিয়ে যতই ফখর করি, তা খুবই কম মনে হবে। কারণ আমার নিয়ামন্দির ইতিহাস অনেক দীর্ঘ ও প্রশস্ত। কয়েক পুরুষ হতে এ মহান প্রতিষ্ঠানের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক রয়েছে। অন্যদিকে এ পূণ্যভুমির মাটি এখনো ঐসকল মহা মণীষির অশ্রুদ্বারা সিক্ত এবং এখানকার পরিবেশ এখনো

তাদের দু'আ ও ক্রন্দন দ্বারা সুঘ্রাণময়, যাঁরা এ এলাকা দিয়ে কাফেলা বানিয়ে অতিক্রম করেছিলেন।[১]

আমি এ সম্মান ও যিম্মাদারী উভয়টায় উপলব্ধি করছি। তারপরেও আমি নিজকে আপনাদের থেকে পৃথক মনে করি না। কারণ আমি তখনো তালেবে ইলম ছিলাম এবং এখনো তালেবে ইলম আছি। আর তালেবে ইলম হয়েই থাকতে চাই। আমার জীবন ইলম ও তালেবে ইলেমের সাথে গেঁথে দেয়া হয়েছে। তাই আমি চাই যে, এ ধারা যেন আজীবন গাঁথা থাকে। আমি আপনাদের সামনে ঐ শব্দ বলতে চাই যা প্রিয় নবী (সা.) আনসার ও মদীনাবাসীদের শানে ইরশাদ করেন : اَلْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ "আমার জীবন তোমাদের সাথে এবং আমার মৃত্যুও তোমাদের সাথে।" আল্লাহ্ আমার এ দু'আ যেন কবূল করেন।

দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার আসল কারণ ছিল দ্বীনী আত্মমর্যাদাবোধ

আমার প্রিয় তালেবে ইলম! আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই যে, আপনাদের এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হবার পিছনে আসল ভূমিকা কী ছিল? আপনাদের এ দরসেগাহের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য কী? নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে এ ক্ষেত্রে বড় বড় যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য উত্তর থাকবে। আপনি যদি বলেন যে, ইলমের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাহলে কে তা অস্বীকার করতে পারবে? যদি বলেন যে, ইখলাসের উপর এর বুনিয়াদ। তাহলে কে তা প্রত্যাখ্যান করবে? যদি বলেন যে, সুন্নাত প্রতিষ্ঠা করা ও বিদ'আতের বিরোধিতার উপর এর বুনিয়াদ বা যদি বলেন যে, বিশেষ পদ্ধতিতে হাদীসের খিদমত করার জন্য এর বুনিয়াদ রাখা হয়েছে, তাহলেও কেউ তা নিয়ে মতবিরোধ করতে পারবে না। এ সকল বিষয় শতবার বরকতময় বস্তু এবং তার উপর যতই ফখর করা হোক না কেন, তা অতি নগণ্য। কিন্তু এ সকল বিষয় এমন, যাতে ভারতের সকল মাদরাসা দারুল উলূম দেওবন্দের সাথে শরীক। তবে, হয়ত এ ক্ষেত্রে স্তর ও মর্যাদাগত পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু সকল মাদরাসা এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়েই প্রতিষ্ঠিত। এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

---

১. কাফেলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রহ.), হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ ও মাওলানা আব্দুল হাই (রহ.)। তাঁরা বালাকটের পথে এখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন।

মাদারাসাসমূহ নিজের বক্ষে ধারণ করে আছে এবং এর মাঝেই তার সঠিক মূল্য ও মূল্যায়ণ নিহিত রয়েছে।

কিন্তু যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের উপর আপনাদের এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যা তার ভিত্তি প্রস্তর রাখার মূল উদ্দেশ্য, (এটি এমন কোন ভিত্তি প্রস্তর রাখা নয়, যা সাধারণত সম্মানিত ব্যক্তি ও মালদার ব্যক্তিদের মাধ্যমে রাখা হয়ে থাকে এবং যার উপলক্ষ্য করে বড় বড় মাহফিল ও জলসার আয়োজন করা হয়ে থাকে) তা হলো দ্বীনী আত্মমর্যাদাবোধ ও ইসলামের হিফাযতের জযবা। বস্তুত এটিই হলো দারুল উলূম দেওবন্দের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

পাশ্চাত্য সভ্যতার ও শিক্ষার ফিতনার মুকাবিলা

ঐ সময় যখন ভারতবর্ষে একটি নতুন সভ্যতার আগমন হয়, তখন এ দেশে একটি নতুন যুগের সূচনা হতে যাচ্ছিল। ঠিক ঐ সময় দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুত দারুল উলূম দেওবন্দ এ চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যে, এখন ভারতবর্ষে যে যুগের সূচনা হতে যাচ্ছে, তা ঈমান বিল গায়বের যুগ নয়, তা মুহাম্মদুর রাসূল (সা.)-কে পথ প্রদর্শক, খাতেমুন রাসূল ও মাওলায়ে কুল বিশ্বাস করার যুগ নয়। এ যুগের সূচনা খতমে নবূওত ও প্রিয় নবী (সা.)-এর শরীআত আখিরী শরীআত এ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে না; বরং যে যুগের সূচনা হতে যাচ্ছে, তার বুনিয়াদ হলো বস্তুবাদী জীবনকে আসল মনে করা, অনুভব করা বস্তুর ও লৌকিকতার পূজা।

সঠিক কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ

ঐ সময় যখন মোঘল সাম্রাজ্যের আলো নিস্প্রভ হয়ে যায়, তখন সে যুগের নূরানী ক্বলবসম্পন্ন আলিমগণ এ বাস্তবতাকে উপলব্ধি করেন যে, মৃতপ্রায় রাষ্ট্রকে বাঁচাতে আমাদের সময় ব্যয় করা এবং এ নিভু নিভু চেরাগ, যার তেল শেষ হয়ে গিয়েছে এবং যার সলতে পুড়ে গেছে, তাকে আবার প্রজ্জ্বলিত করা শুধু মুশকিল কাজই নয়; বরং একটি নিরর্থক কাজ। কারণ, যে গাছ শুকিয়ে গেছে, তা বাঁচার যোগ্যতা হারিয়েছে এবং তার সজীবতা শেষ হয়ে গেছে, তাকে বাইরের কোন উপকরণ দ্বারা সজীব রাখা বা বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। যেন ঐ সকল আলিমের সামনে বিশিষ্ট দার্শনিক ও ঐতিহাসিক ইবন খলদূনের এ প্রজ্ঞাময় উক্তি ছিল যে,' اَلْهَرَمُ اِذَا نَزَلَ بِالدَّوْلَةِ لَا يَرْتَفِعُ "যখন কোন রাষ্ট্র বার্ধক্যে উপণীত হয় তখন তার বার্ধক্য দূর করে নতুনভাবে তাকে যৌবন দান করা সম্ভব নয়।" তাঁরা মনে করেন যে, যদি কোন প্রতিষ্ঠান জীবন শেষ করে মৃত্যুপথের পথিক

হয়ে যায় এবং তার প্রাণবায়ু উড়ে যাবার সময় হয়ে যায়, তাকে কোন তেলেসমাতির কারিশমাঁ দ্বারা বাঁচিয়ে রাখা যায় না। ফলে, তাঁরা নিজেদের যোগ্যতাসমূহের দ্বীনদারী ও আমানতদারীর সাথে বাস্তবসম্মত পর্যালোচনা করেন। অতঃপর নিজেদের যোগ্যতাসমূহকে অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করে ইসলামী সভ্যতা ও ইসলামী উলূমের হিফাজত করার জন্য স্থির করেন। তাঁদের ইয়াকীন ছিল যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে আমাদেরকে যে জীবন বিধান ও যে কিতাব প্রদান করা হয়েছে, শরী'আতের যে বিধি-বিধান প্রদান করা হয়েছে, যে সভ্যতার ওয়ারিস বানানো হয়েছে, আমাদেরকে যে সকল উসূল ও মূলনীতি প্রদান করা হয়েছে তার সাথে শীত ও বসন্ত, যৌবন ও বার্ধক্য, উন্নতি ও অবনতি, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন, হায়াত ও মওতের এ স্বাভাবিক নিয়ম কার্যকর নয়। যদিও তা গোটা বিশ্বজগতের মাঝে কার্যকর রয়েছে। এ মর্মে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হলো :

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔

"তার কাছে মিথ্যা না আগে থেকে আর না পিছে থেকে আসতে পারে। এ তো প্রশংসিত ও মহা প্রজ্ঞাময়ের পক্ষ হতে নাযিলকৃত।" [সূরা হামীম সাজদা : ৪২]

এর হাকীকত হলো এই যে,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا۔

"আজকে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছি এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করেছি ও তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে পছন্দ করেছি।" [সূরা মায়িদা : ৩]

এ ঘোষণা তার স্থিতিশীলতা ও স্থায়িত্বের যামিন। তাই তাঁরা তাদের সকল শক্তি ইসলামী উলূমের হিফাজত ও ইসলামী সভ্যতাকে স্বস্থানে শুধু যে বহাল রাখার ক্ষেত্রে ব্যয় করেছেন তা নয়; বরং তার পরিধি বিস্তৃত করেছেন এবং জীবনের সাথে তার সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও ব্যয় করেছেন। এটি আল্লাহ্ তা'আলার খাস তাওফীক ও সহযোগিতা ছিল। ফলে, তাঁরা নিজেদের চেষ্টা ও প্রচেষ্টার জন্য সঠিক কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করতে সক্ষম হন। এ সময় তাঁদের ন্যূনতম ভুল শত শত বছর পিছনে নিয়ে যেত এবং এ ক্ষতি আর কখনো পূরণ হবার ছিল না।

মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী সাহেব (রহ.)-এর আসল বিশেষত্ব

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী (রহ.) ও তাঁর মহান সঙ্গি মাওলানা রশীদ আহমদ সাহেব গাঙ্গুহী (রহ.) ও অন্যান্য সাথীগণের মাঝে যে জযবা কার্যকর ছিল, তা হলো দ্বীনী আত্মমর্যাদাবোধের জযবা। এ জযবাই তাঁদেরকে এ দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী (রহ.) দ্বীনী ইলমের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখতেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ইলমে কালাম ও মাআরিফে ইলাহির ক্ষেত্রে দরাজ হস্ত ও রহস্য উদঘাটনের অসাধারণ যোগ্যতা ও দৌলত প্রদান করেন। এর প্রমাণ হলো তাঁর মূল্যবান গ্রন্থসমূহ। যেমন 'আবে হায়াত', 'তাকরিরে দিলপযীর', এবং 'হুজ্জাতুল ইসলাম' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ইসলামী আত্মমর্যাদাবোধ পূর্ণমাত্রায় দান করেছিলেন এবং আল্লাহ্ তাঁকে অস্থির হৃদয় ও উত্তাল দিল প্রদান করেন। তিনি দেখতে পান যে, যে ভারতবর্ষে আমাদের পূর্বসূরীগণ নিজেদের সর্বোত্তম যোগ্যতাসমূহ ব্যয় করেছেন এবং যারা ইসলামের খিদমতে এবং দ্বীনী ইলমের ময়দানে এমন উল্লেখযোগ্য খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন যার নযীর বড় বড় ইসলামী দেশ পেশ করতে অক্ষম।

ইসলামী ইতিহাসের সোনালী অধ্যায় ছিল মুসলমানদের প্রখর মেধা ও তাঁদের ইজতিহাদী শক্তি, তাঁদের সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও সাহসিকতা প্রকাশের সর্ব বৃহৎ ময়দান। তাঁরা যে শুধু ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের খিদমতে অংশগ্রহণ করেছেন, তা নয়; বরং তাঁরা তাঁকে সমৃদ্ধি করেছেন। তাঁরা ইসলামী কুতুবখানাতে এমন কিছু গ্রন্থ সংযোজন করে তাকে সমৃদ্ধি করেন যার নযীর ইসলামের সুবিশাল ইতিহাসে পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। তাই এত সহজেই কী এ বিশাল দেশকে পাশ্চাত্য সভ্যতার গ্রাসে পরিণত হতে দেয়া এবং পাশ্চাত্যের পতাকাবাহীদের হাতে ছেড়ে দেয়া হবে? আমরা কী স্বচক্ষে দেখব যে, মুসলমানদের নতুন প্রজন্ম, সিদ্দীকী, ফারূকী, উসমানী, আলাবী এবং সৈয়দ ও শেখ পরিবারের চোখের মণিরা, যাদের মহান পূর্বসূরীগণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং ইসলামী শিক্ষালাভে ধন্য হয়েছে, যারা ইসলামের নূরকে নিজেদের দিলের সাথে স্থাপন করেছেন এবং বড় বড় তুফান, টর্পেডোতেও তা নিস্প্রভ হতে দেননি, তাঁরা ইসলামী সভ্যতা, সামাজিক রীতিনীতি এবং সুন্নত ও শরীআতের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে খালেস বস্তুবাদী ইংরেজদের হাতের মুঠোয় চলে যাবে এবং

তাদেরকে নিজেদের নতুন সভ্যতা ও শিক্ষার আদলে গড়ে মুসলমানদের এক নতুন প্রজন্ম, বরং সঠিক শব্দে দুনিয়াদারদের একটি নতুন প্রজন্ম প্রস্তুত করা হবে? যারা নাম ও জাতীয়তা ছাড়া পূর্বের মুসলিম জাতির সাথে আর কোন জিনিসে মিল ও মুনাসিবাত করা যাবে না।

এ প্রশ্নটিই হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহ.)-এর সামনে একটি সমস্যা হিসেবে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। সমস্যা শুধু যে একটি মাদরাসা বা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ছিল না, বরং আমি মনে করি যে, দারুল উলূম দেওবন্দের মর্যাদাকে খাটো করে দেখার অপরাধ হবে যদি বলা হয় যে, দারুল উলূম মাত্র গুটি কয়েক বিশেষ কিতাব পাঠদানের জন্য এবং দরস ও তাদরীসের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এ থেকে বড় জুলুম তার প্রতিষ্ঠাতাদের ক্ষেত্রে আর হতে পারে না। যারা এরূপ মনে করে, তাদেরকে অবশ্যই ঐ বুযর্গদের রূহের সামনে লজ্জিত হতে হবে। যদি কখনো বলা হতো যে, দারুল উলূম দেওবন্দ শুধু একটি মাদরাসা, তাহলে হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) আঁতকে উঠতেন। কারণ তাঁর কাছে এটি ইসলামের একটি দূর্গ ছিল, ইসলামী সৈন্য দলের ও ধর্ম প্রচারকদের জন্য একটি ট্রেনিং ক্যাম্প এবং মোঘল সাম্রাজ্যের নিস্প্রভ বাতির পরিপূরক; বরং উত্তম পরিপূরক ছিল।

ব্যাস, মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহ.)-এর সামনে এটিই ছিল আসল সমস্যা। তাহলে কী ভারতকে ইংরেজ ডাকাতদের হাতে তুলে দেয়া হবে? আমরা কী আমাদের কলিজার টুকরা সোনার ছেলেদেরকে, যাদেরকে আমরা আমাদের কলিজার রক্ত দ্বারা লালন পালন করেছি, যাদের ধমনীতে উলামা ও নেককারদের রক্ত প্রবাহিত ও সঞ্চালিত, তারা কী আমাদের চোখের সামনে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাবে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার ছত্রছায়ায় বড় হবে ও আমাদের থেকে পরিপূর্ণভাবে ভিন্ন ও অপরিচিত হয়ে বের হয়ে আসবে? তিনি ইংরেজ সরকারের এ চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করেন এবং তাঁর পিতামহ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ভাষায় বলেন যে–

أَيَنْقُصُ الدِّيْنُ وَأَنَا حَيٌّ

"আল্লাহর দ্বীন ধ্বংস হয়ে যাবে আর আমি বেঁচে থাকব?"

আজ থেকে সাড়ে তের শ' বছর পূর্বে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর যবান মুবারক হতে যে বাক্য নির্গত হয়েছিল, তা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহ.)-এর অবস্থার বাস্তব চিত্র ছিল। এ ঐতিহাসিক বাক্যটি ইতিহাসের ধারাকে

পাল্টে দেয় এবং যুগের মোড় পরিবর্তন করে দেয়। এটি একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য নয়; বরং এটি একটি যুগের শিরোনাম এবং একটি ইতিহাসের সারসংক্ষেপ। যদি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর কোন জীবনী গ্রন্থ রচিত নাও হত, তবু তাঁর এ বাক্যটি তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ হবার জন্য যথেষ্ট ছিল। এটি আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি ইলহামী বাক্য ছিল, যা তাঁর যবান মুবারক হতে নির্গত হয়েছিল। একটি সিংহ যদি প্রকম্পিত হয়ে, লম্প ঝম্প দিয়ে এসে গর্জন করে এবং তার গর্জনে যদি পুরা জঙ্গল প্রকম্পিত হয়ে উঠে, তা থেকেও অধিক দুঃসাহসিকতা ও আক্রমণাত্মক এবং তা থেকেও অধিক বীরত্বপূর্ণ ও আত্মমর্যাদাপূর্ণ ভাব এ বাক্যের মাঝে রয়েছে। আমি মনে করি যে, দারুল উলূম দেওবন্দ ও দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা-এর প্রতিষ্ঠাতাগণকে যে বস্তু রাহনুমায়ী করেছিল, তা ছিল এ অনুভূতি। তাঁদের কখনোই এ উদ্দেশ্য ছিল না যে, তাঁরা শুধুমাত্র নাহু ও সরফের শিক্ষা প্রদান এবং উলূমে শরীআহ ও উলূমে ফালসাফা শিক্ষা দানের জন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করবেন। এ জন্য তো মিসরের আল-আযহার, তিউনিসের জামেয়া যাইতুনিয়া, মরক্কোর জামেয়া কুরুনিয়া ও ভারতবর্ষের কয়েকটি বিখ্যাত ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যথেষ্ঠ ছিল। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে টক্কর দিয়ে কোন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা এবং এ সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় শুধুমাত্র তালিম ও তায়াল্লুমের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান করা বুদ্ধিমত্তা ও দুঃসাহসিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতো না।

অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক ও চিরন্তন প্রতিশ্রুতি

মূলত এ দ্বীনী আত্মমর্যাদাবোধ মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী (রহ.)-কে অস্থির করে রেখেছিল। ফলে, তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদরাসাটি অতি ক্ষুদ্র পরিসরে এবং অনুপলব্ধ পদ্ধতিতে কাজ শুরু করে। এ বিষয়টি হয়ত সে সময়ের অনেক ভাল ভাল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিও উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। কিন্তু তাঁর মাকসাদ অত্যন্ত মহান ও মহৎ ছিল। আর সে মাকসাদ হলো, ভারতবর্ষে ইসলামী সভ্যতা, ইসলামী সমাজ, ইসলামী জ্ঞান ও ইসলামী শরী'আতের জন্য একটি দূর্গ নির্মাণ করা এবং এ দাওয়াতকে কর্মতৎপর করে তোলা :

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهِ.

"এবং এ বিষয়টিকে নিজের ভবিষ্যত প্রজন্মের চিরন্তন বাণী রেখে গেছে যাতে তারা আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে।" [সূরা যুখরফ : ২৮]

তাঁর সকল প্রচেষ্টার সার-সংক্ষেপ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যতদিন ভারতবর্ষে মুসলমান জীবিত থাকবে, তাদের সম্পর্ক যেন মিল্লাতে ইব্রাহিমী ও শরীআতে মুহাম্মদীর সাথে চির অটুট থাকে এবং তারা যেন এ দ্বীন ও শরীআতকে মেনে চলে, যা তাদের কাছে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসুল (সা.)-এর মাধ্যমে এসে পৌছেছিল। আবার, যখন তার মৃত্যু হয় তখনো যেন সে এ ধর্মের অনুগত ও তার জন্য আত্মোৎসর্গকারী হিসেবে যেতে সক্ষম হয়। এ যেন ঐ অসীয়ত ও চুক্তিপত্রের বাস্তব নমুনা, যার কথা পবিত্র কুরআন মাজীদে উল্লেখ করা হয়েছে :

وَ وَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَ يَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ۔

"আর ইব্রাহীম স্বীয় পুত্রকে এবং ইয়াকূবও এ কথার অসীয়ত করেন যে, বৎস! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য এ দ্বীনকে নির্বাচন করেছেন। সুতরাং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করবে না।" [সূরা বাকারা : ১৩২]

নতুন যুগ, নতুন ফিতনা

প্রিয় তালেবে ইলম! আপনাদের এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দ্বীনী আত্মমর্যাদাবোধের ভিত্তিতে এবং আপনাদের এ প্রতিষ্ঠানের মৌলিক উদ্দেশ্যই হলো যুগের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা। তাই বর্তমান যুগের নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে আপনি থাকতে পারবেন না। বিশেষ করে, দারুল উলূম দেওবন্দ ও নদওয়ার পক্ষে এ চ্যালেঞ্জের প্রতি দৃষ্টিপাত না করার কোন বৈধতা নেই। কারণ যুগের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্যই এর বুনিয়াদ রাখা হয়েছে। কেননা, পশ্চিমা সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থা এবং ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থা, যার সাথে কোন প্রকার ধর্মীয় দিক-নির্দেশনা এবং আখলাকী তালিম ও তরবীয়তের কোন প্রকার ব্যবস্থা ছিল না, তা সে যুগের ফিতনা হিসেবে আবির্ভূত হয়।

কিন্তু ফিতনা কখনো যুগের গন্ডির সাথে আবদ্ধ থাকে না এবং এক ফিতনাই সব সময় আসে না; বরং নতুন নতুন ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে, ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য নতুন নতুন বিপদ সামনে আসে। জাহিলিয়ত নবরূপে আবির্ভূত হয় এবং অত্যন্ত উদ্যমের সাথে ময়দানে নামে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইকবাল মিথ্যা বলেননি।

তিনি বলেন :

اگرچہ پیر ہے مؤمن جواں ہیں لات و منات

"যদিও মুমিন বার্ধক্যে উপণীত হয়ে গেছে কিন্তু লাত ও মানাত তো এখনো ভরা যৌবনে রয়েছে।"

এটি অত্যন্ত ভয়ংকর কথা যে, এখনো লাত ও মানাত অর্থাৎ বাতিল শক্তি ও পুরাতন জাহিলিয়াত তো জীবন ও উদ্যমতায় পরিপূর্ণ। আর মুমিন, যে সাইয়্যিদিনা ইব্রাহীম (আ.) এর ওয়ারিস ও তার প্রতিনিধি, তার মাঝে অকর্মণ্যতা, অলসতা, হীন্যম্মনতা, অক্ষমতা, পিছুটান ও নির্লিপ্ততা থাকার মানসিকতা সৃষ্টি হচ্ছে। লাত ও মানাত নতুন উদ্যমের সাথে, নতুন স্বপ্ন ও গর্জনের সাথে, নতুন প্রস্তুতি ও নতুন কর্মপদ্ধতির সাথে, নতুন নতুন স্লোগান ও নতুন নতুন হুংকারের সাথে ময়দানে আবির্ভূত হচ্ছে আর মুমিন এখনো সুখ নিদ্রার মৃত্যুপুরীতে বিভোর হয়ে রয়েছে। তার শক্তিতে ভোঁতা-ভাব ও জরাজীর্ণতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। সে জীবনের কর্মক্ষেত্র হতে পালিয়ে অথবা নির্লিপ্ত হয়ে কোন নিরাপদ আশ্রয় তালাশ করছে এবং সে জীবনের বাকি দিন নিরাপদে কাটিয়ে দিচ্ছে। আর লাত ও মানাত বুক ফুলিয়ে ময়দানে এসে দাঁড়িয়ে প্রতিযোগিতার আহবান জানাচ্ছে।

আধুনিক যুগের ভয়ংকর ফিতনা

প্রিয় তালিবে ইলম! এ যুগের ফিতনা ও চ্যালেঞ্জ কী? এ যুগের ফিতনা ও চ্যালেঞ্জ হলো ইসলামকে তার নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি, তার নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থা, তার নিজস্ব পারিবারিক আইন, তার নিজস্ব শিক্ষানীতি, তার নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য ও লিপি হতে এবং তাকে তার পূর্ণ ঐতিহ্য হতে পৃথক করে গুটি কয়েক ইবাদত ও রীতিনীতি এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাঝে সীমাবদ্ধ করে দেওয়ার প্রবণতা। যা অন্যান্য ধর্মের সর্বসাকুল্য সম্পদ এবং কোন কোন ধর্মের একটি নিদর্শন মাত্র। যেমন, বিয়ে-শাদি ও দুঃখ-বেদনার সময় কি করা উচিত, মৃত ব্যক্তিকে তার জীবনের শেষ স্তর কিভাবে অতিক্রম করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন ইসলামও তদ্রুপ একটি ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতির সমষ্টিতে পরিণত হয়ে থাকবে।

আমি জানি না যে, আগামী কাল কি ঘটবে? কিন্তু তারপরেও বলতে চাই যে, সম্ভবত এ অবস্থা এখনো অনেক দূরে রয়েছে যে, হয়ত একদিন ভারতের মুসলমানদেরকে বলা হবে যে, এ দেশে তোমাদের নামায পড়ার অনুমতি নেই।

তোমাদের কোন বিশেষ আক্বীদা-বিশ্বাস রাখার অধিকার নেই, তুমি রোযা রাখতে পারবে না, তুমি যাকাত দিতে পারবে না। কিন্তু এ অবস্থা অবশ্যই এসে গেছে যে, এ দেশে ইশারা ও ইঙ্গিতে, আবার কখনো সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হচ্ছে যে, মুসলমান যেন স্বেচ্ছায় ও সানন্দে নিজেদের স্বতন্ত্র সভ্যতা ও রীতিনীতি এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হতে সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয়। কারণ, ঐ সকল বস্তু তাদেরকে একটি ভিন্ন মিল্লাত এবং একটি স্বতন্ত্র সভ্যতার দাবিদার হবার অনুভূতি সৃষ্টি করে। তারা যেন নিজ থেকে ঘোষণা করে যে, তারা কোন পৃথক সভ্যতার ধারক ও বাহক নয়।

তারা নিজেরাই মুসলিম পারিবারিক আইনের পরিবর্তন ও সংস্কারের দাবি করে এবং নিজেদের জন্য ঐ একই ধরনের আইনের দাবি করে, যা সারা দেশের জনগণের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। তারা যেন নিজেদের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা তারা নিজেদের জরুরতে প্রতিষ্ঠা করেছিল, স্বেচ্ছায় সরকারের নিয়ন্ত্রণে ও ব্যবস্থাপনায় হস্তান্তর করে এবং এর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা হতে নিজেরা যেন অবসর গ্রহণ করে। যাতে ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতেও একই ধরনের মানুষ তৈরি হয়, যারা এ সেকুলার ও সমাজতান্ত্রিক দেশে বসবাসের উপযুক্ত হয়। সরকার ইসলামের বিরোধিতা করে না এবং তাদের ইসলাম ধ্বংসের কর্মতৎপরতার প্রতি কোন আগ্রহও নেই। কারণ তারা তো ফখর করে যে, এ দেশে বিশ্বের অধিক সংখ্যক মুসলমান বসবাস করে।

তাই, তাদের বসবাস করা ও তাদের ফলপ্রসু হয়ে অবস্থান করা উচিত। কারণ তাদের দ্বারা মহৎ ও মহান কাজ নেয়া সম্ভব এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ও রাজনৈতিক বিষয়ে তাকে দলীল হিসেবে পেশ করা যেতে পারে। তথাপি, আজকে এ দেশে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হচ্ছে যে, মুসলমান যদি এ দেশে বসবাস করতে চায়, তাহলে তাদেরকে জাতীয় ধারাতে বিলীন হয়ে যাওয়া উচিত। আর জাতীয় ধারার অর্থ হলো এই যে, মুসলমানগণ নিজেদের যাবতীয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হতে মুক্ত হয়ে যাবে। তাই আজকের দাবি হলো মুসলমানকে মুসলমান হয়ে বসবাস করতে হবে। কেউ তাকে নিষেধ করবে না। এ সব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা একটি রোগীর পাগলামী ভাব যা সবসময় থাকে না।

আপনারা লক্ষ্য করছেন যে, তা কমে আসছে এবং আমি আরো ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, তা আরো কমে যাবে। আমার নিকট এটি আসল সমস্যা নয়। আসল বিপদ জন্ম নিয়ন্ত্রণও নয়; বরং আসল বিপদ হলো অভ্যন্তরীণ মুরতাদ হওয়া, মানসিক ও সাংস্কৃতিক মুরতাদ হওয়া। এ বিপদকে দেখা ও উপলব্ধি করার জন্য

কোন ফেরাসত বা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হবার প্রযোজন নেই। এ তো দেয়ালে খোদাই করে লিখিত বস্তুর মত সকলেই তা পড়তে সক্ষম। আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে চক্ষু প্রদান করেছেন, তারা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে যে, আজকে আলীগড়ের সমস্যা তো আগামীকাল দারুল উলূম দেওবন্দ ও নদওয়াতুল উলামার সমস্যায় পরিণত হবে। সময় ও অবস্থার মাসয়ালা। এ সকল সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে এ বিষয়ের উপর যে, আমরা আলীগড়ের সমস্যাতে কতটুকু প্রাণের স্পন্দন ও উদ্যমতা এবং কতটুকু গায়রত ও আত্মমর্যাদাবোধের প্রমাণ পেশ করতে পেরেছি।

বিদ'আত মুকাবিলাকারীদের উত্তরসূরী ও তাদের যিম্মাদারী

আমার প্রিয় তালেবে ইলম! আপনাদের মহান পূর্বসূরীগণ তো এমন ছিলেন যে, তাঁরা কখনো বিদ'আতের সাথে সামান্যতম আপোস করেননি। আপনার আকাবিরা আজো মীলাদে কিয়াম করার অনুমতি প্রদান করেননি। কত অসংখ্য রসম ও রেওয়াজ মুসলমানদের জীবনে অনুপ্রবেশ করেছে এবং তা ধর্মীয় আমল ও রীতিনীতির মর্যাদা লাভ করেছে কিন্তু আপনি যে, চিন্তাধারা ও মাসলাকের সাথে সম্পৃক্ত, তার আলিমগণ সবসময় এগুলোর বিরোধিতা করেছেন এবং এগুলোকে বিদ'আত ও ভিত্তিহীন ঘোষণা করেছেন। আর এ কারণে তাঁদেরকে সামাজিকভাবে ও ইজতেমায়ী জীবনে অনেক কুরবানী দিতে হয়েছে। তাঁদেরকে বয়কট করা হয়েছে, তাঁদেরকে মসজিদ হতে বের করে দেয়া হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কাফির ও গোমরাহ্ ফতোয়া প্রদান করা হয়েছে এবং তাঁদেরকে অসংখ্য দুনিয়াবী স্বার্থ ও আরাম-আয়েশ থেকে মাহরূম হতে হয়েছে।

তারপরেও তাঁরা ঐ সকল কার্যকলাপের ব্যাপারে সামান্যতম শিথিলতা প্রদর্শন করেনেনি এবং কোন প্রকার আপোস ও মাসলাহাতের দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করেননি। আমার নিজেরই ঐ ক্যাম্পের সাথে সম্পর্ক যারা শির্ক বিদ'আতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। বরং আমার সম্পর্ক তো ঐ খান্দানের সাথে যারা শির্ক ও বিদ'আতের ক্ষেত্রে অতিশয় সংবেদনশীল প্রমাণিত হয়েছেন।

আমার রূহানী, খান্দানী ও মানসিক সম্পর্ক হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রহ.) ও মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর সাথে, যাঁরা এ দেশে তাওহীদ ও সুন্নাতের পুনঃজীবন প্রদানের আহবান জানিয়েছিলেন ও তার পতাকা উত্তোলন করেছিলেন এবং এ জন্য জীবন বাজি রেখেছিলেন। যদি আমার এ দুঃসাহসিকতাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহলে আমি বলব যে,

আপনাদের এ প্রতিষ্ঠানে এ চিন্তাধারা ও এ দাওয়াত এবং এ হামিয়ত ঐ চিন্তা থেকেই এসেছে। এ কারণে আমার নিকট ইতিহাসের এ পূর্ণাঙ্গ ধারা অতি প্রিয়। আমি গোটা ঐতিহ্যকে সীনার সাথে; বরং চোখের মণিতে লাগিয়ে রাখি। আমি তা নিয়ে লজ্জাবোধ করি না এবং তা থেকে পিছু হটতেও রাজি নই। আমার সকল রচনা, আমার নগণ্য প্রয়াস ও প্রচেষ্টার সবকিছুই ঐ ঐতিহ্যের হিফাযত, তার তাবলীগ ও ইশাআত এবং তার দাওয়াতে ব্যয় হয়েছে।

میں کہ میری نوا میں ہے آتش رفتہ کا سراغ
میری تمام سرگذشت کھوئے ہوؤں کی جستجو

"আমি ও আমার অস্থি-মজ্জায় রয়েছে দূর্বার আগুনের ঠিকানা
আমার সকল প্রয়াস তো স্বজনহারাদেরই প্রচেষ্টা।"

আমার ভোতা কলম 'দাওয়াত ও আযীমতের' দাস্তান বিস্তারিতভাবে রচনা করেছে এবং এ বিষয়ে কয়েক হাজার পৃষ্ঠা লিখেছে। তাই, আমার ঐ সকল গ্রন্থের লেখক হিসেবে অধিকার রয়েছে যে, আমি আপনাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করব।

আপনারা ঐ সকল আকাবিদের উত্তরসূরী যাঁরা দ্বীনের সামান্য বিকৃতি এবং মুসলমানদের সামান্য বিচ্যুতি বরদাশত করেননি। কিন্তু আজকের সমস্যা বিদ'আতের নয়, আজকের সমস্যা ইংরেজী শিক্ষার নয়, আজকের সমস্যা হলো একদিকে প্রকাশ্য শির্ক ও মূর্তি পূজার, প্রকাশ্য পৌত্তলিক আক্বীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করার, আজকের সমস্যা হলো হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা ও ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতি গ্রহণের প্রবণতা। অন্যদিকে আজকের সমস্যা হলো কমিউনিজম ও পুরাপুরি ধর্মহীন-তাকে গ্রহণ করাকে প্রতিরোধ করার। আজকের সমস্যা হলো এমন এক জাতির মর্যাদা গ্রহণ করা যারা ধর্মকে নিজেদের সকল কুরবানী ও ভবিষ্যতকে এ দেশের সাথে জুড়ে দিয়েছে যা থেকে আমাদের দেহের বাহ্যিক কাঠামো গঠিত হয়েছে। এ দেশের জন্যই জীবন ও মরণ। আজকের চ্যালেঞ্জ ও আজকের বিপদ বিগত দিনের চ্যালেঞ্জ ও বিপদসমূহের তুলনায় অনেক অনেক গুণ বেশি ভয়ংকর। এ সব চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য আরো বেশি সৎসাহস, আরো অধিক ঈমান ও আত্মবিশ্বাস এবং আরো অধিক ত্যাগ ও কুরবানীর প্রয়োজন।

বর্তমান যুগের ইনকিলাব বিদ্যুৎ গতিসম্পন্ন ও বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত

আগের দিনের বিপদসমূহ অত্যন্ত ধীর গতিসম্পন্ন হতো এবং তা আস্তে আস্তে আসত। যেমন যুগ ছিল, তেমনি পরিবর্তন ছিল। তখন গরুর গাড়ি ও হাতি বা উটের পিঠে চড়ে আসার যুগ ছিল; বরং বেশি থেকে বেশি দ্রুতগামী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আসার যুগ ছিল। তাই, সময়ের ইনকিলাবসমূহ ঐ সকল সওয়ারীর গতিতে আসত। অতঃপর, ট্রেন যুগের সূচনা হয়। তখন ইনকিলাব ট্রেনে সফর করে আসত। আবার, যখন বিমানের যুগের সূচনা হলো, তখন ইনকিলাবের গতি ত্বরান্বিত হয়। এখন ইনকিলাব এটমিক এনার্জি প্রয়োগ করছে। ফলে, ফিতনা শব্দের গতিতে, রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে সেকেন্ডে সেকেন্ডে ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে।

গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রের ব্যাপক বিস্তৃত পরিধি

বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যুগ। আমাদের উপর পার্লামেন্ট সরকারের ক্ষমতা চলছে। তাদের রয়েছে স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা। এখন রাষ্ট্রের কাজ শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা ও ট্যাক্স আদায় করা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা এখন জীবনের সকল শাখা-প্রশাখা এবং শিক্ষা-দীক্ষার সকল উপকরণ নিয়ন্ত্রণ করছে। ঘরের ভিতর ও বাইরের কোনকিছুই তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। রাতে যদি পার্লামেন্টে কোন আইন পাশ হয় তো দিনে তা সারা দেশে বাস্তবায়িত হয়। এখন আমরা এখানে বসা রয়েছি কিন্তু এখন হয়ত পার্লামেন্টে কোন অধিবেশন হচ্ছে এবং সেখানে কোন আইন পাশ হচ্ছে এবং তা আমাদের জীবনে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করছে। আপনারা অবগত আছেন যে, পূর্বের সরকার প্রাইভেট বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করত না। ব্যক্তিগত বিষয়াদী নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা ছিল না। স্বাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে তাদের কোন পেরেশানী ছিল না। আপনি যাকে পারিবারিক আইন বলেন, যেমন বিয়ে-শাদি, দাফন-কাফন ও মীরাসের বন্টন ইত্যাদি বিষয়ে তাদের কোন হস্তক্ষেপ ছিল না।

শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ কোন আক্বীদা- বিশ্বাস ও বিশেষ কোন চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর পীড়াপীড়ি ছিল না। কিন্তু আজকে দুনিয়া বদলে গেছে। আপনার চিন্তা করা উচিত যে, আপনি যে স্থানে এখন বসা আছেন, সেখানে কি যুগের পরিবর্তন হঠাৎ এনে বসিয়েছে? আজ আপনারা একটি সীমাবদ্ধ স্থানে বসে অত্যন্ত আনান্দিত। আজ এখানে চারপাশে নূরানী চেহারা নজরে আসছে,

আপনার কানে 'ক্বলাল্লাহ' ও 'ক্বলার রসূল' ছাড়া অন্য কোন আওয়াজ গুঞ্জরিত হচ্ছে না। এটি আপনাদের দারুল- হাদীস, ঐটি আপনাদের দারুত-তাফসীর, এইতো মসজিদের রূহানী মহল এবং মাদরাসার ইলমী পরিবেশ। কিন্তু, কাল যখন আপনি এখান থেকে চলে যাবেন, আর কাল বলতে আমার উদ্দেশ্য এই নয় যে, যখন আপনি এখান থেকে পাশ করে চলে যাবেন, বরং আমার উদ্দেশ্য হলো, যখন আপনি ছুটিতে বাড়ি যাবেন, তখন আপনি সেখানে দুনিয়াকে অনেক পরিবর্তিত দেখতে পাবেন। আমি বলতে পারবো না যে, আপনাদের ছুটি পর্যন্ত এ দেশে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটবে। আপনি যদি আপনার আশেপাশের দুনিয়া পর্যবেক্ষণ না করেন তাহলে আপনি নিজেই এ জগতে অপরিচিত হয়ে যাবেন।

অভ্যন্তরীন বিপদ

বর্তমান মুসলমানদের জন্য বড় ভয়ের কারণ এই যে, স্বয়ং মুসলমানদের ভিতরে এমন একটি দল সৃষ্টি হয়েছে যারা অমুসলিমদের তুলনায় দাবিদার ধীর গতির আর সাক্ষী সরব প্রকৃতির এ প্রবাদ বাক্যের বাস্তব নমুনাতে পরিণত হয়েছে। তারা যদি কোন কথা একটু আধটু ও অস্পষ্ট ভাষায় বলে, তো এরা ডংকা বাজিয়ে বলতে প্রস্তুত। এরা সুস্পষ্ট ভাষায় আহবান জানায় যে, মুসলমানদের এখানে সাধারণ সভ্যতার মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়া উচিত এবং সকল ইসলামী বৈশিষ্ট্য, এমন কি চীনা মুসলমানদের মত আরবী ও ইসলামী নাম না রাখা উচিত। তাদের দাবি হলো, যদি আমাদেরকে ভারতে থাকতে হয়, তাহলে সবকিছু হতে মুক্ত হতে হবে যাতে 'আমি ও তুমি'-এর পার্থক্য শেষ হয়ে যায় এবং যা মসজিদ ও গীর্জার মাঝে পার্থক্য করে, তা হতেও মুক্ত হয়ে যায়। বর্তমানে যে ধরনের মানসিকতার লোকেরা ভারতের নেতৃত্ব প্রদান করছে, তারা এমন কোন বস্তু দেখলেই, যাতে নূন্যতম স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকে, তাদের গাত্র দাহ হয়।

স্বকীয়তা ও স্বচ্ছতা ইসলামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

কিন্তু আমাদের ধর্মের সীমারেখা নির্ধারিত, বহু ধর্মের এ দেশে আমাদের ধর্মের নিজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও আকৃতির সাথে বিদ্যমান থাকার পিছনে রহস্যই হলো এই যে, তাতে আর্যধর্মের মত মুক্তমনা ও স্বাতন্ত্র বিমুখিতা নেই, নেই তার মাঝে কোমলতা ও নমনীয় মনোভাব; বরং আমাদের এখানে ঈমান ও কুফর, শির্ক ও তাওহীদ, ভ্রষ্টতা ও হিদায়াত এবং হালাল ও হারামের মাঝে সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا۔

"আর যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করল এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়ন করল, সে তো এমন এক মজবুত রশিকে শক্ত করে ধরল যা কখনো ছিন্ন হবার নয়।" [সূরা বাকারা : ২৫৬]

সকল ধর্মই এক নয়, বরং হক একটি

ইসলাম সকল ধর্মই এক হবার পক্ষে কথা বলে না, বরং তার আহবান হলো হক একটি। অর্থাৎ সকল ধর্মই এক নয় বরং সত্য ধর্ম হলো একটি। তাই ইসলামের সুস্পষ্ট ঘোষণা হলো :

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۖ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ۔

"আর হক কথা সুস্পষ্ট প্রকাশিত হবার পরে গোমরাহী ছাড়া আর কী থাকে? সুতরাং তোমরা কোথায় চালিত হচ্ছো?" [সূরা ইউনুস : ৩২]

ইসলামের কাছে আক্বীদার সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত মুলনীতি রয়েছে। তার রয়েছে একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা, পরিপূর্ণ জীবন বিধান ও পূর্ণাঙ্গ সমাজ ব্যবস্থা। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا۔

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করে দিলাম ও ধর্ম হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য পছন্দ করলাম।" [সূরা মায়িদা : ৩]

এখানে কেউ নিজকে যেমন ধোঁকা দিতে সক্ষম নয়, তেমনি অন্যকেও ধোঁকা দিতে পারে না। এখানে রয়েছে দিবালোকের আলোক রশ্মি। তাতে সাদা ও কালো সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন দু'জন মহাপুরুষ

প্রিয় তালেবে ইলম! দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী (রহ.) ও নদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গিরী (রা)-কে কোন জিনিস অস্থির করে তুলেছিল? একজনকে এখানে

এবং আরেকজনকে ওখানে। আমি তাঁদের দু'জনের মাঝে কোন পার্থক্য আছে বলে মনে করি না। আমি তাঁদের দু'জনকে একটি সুন্দর চেহারার দু'টি চোখের মত মনে করি। তাঁরা উভয়েই রৌশন ও পাক-পবিত্র। বরং উভয়ের মাঝে একই নূরে বাতেন ও একই ফেরাসতে ঈমানী কাজ করেছে। তারা উভয়েই–

يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللّٰهِ اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهٗ

"তোমরা মুমিনের ফেরাসতকে ভয় কর। কারণ, মুমিন আল্লাহ্‌র নূর দ্বারা অবলকন করে।" এ হাদীস শরীফের বাস্তব নমুনা ছিলেন। উভয় শিক্ষা কেন্দ্রের পাঠ্যসূচি একটি উপকরণ ছিল মাত্র, মাকসাদ ছিল না। তাঁদের মাঝে সৃষ্ট মতবিরোধ মৌলিক কোন মতবিরোধ ছিলনা। মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গিরী (রহ.) ও তাঁর সহকর্মীদের লেখা পাঠ করুন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এ ধরনের ছোটখাট বিষয়ের অনেক ঊর্ধ্বে ছিল। কেউ যদি মনে করে যে, তিনি আরবী সাহিত্যকে প্রাধান্য দেবার জন্য বা ইসলামের ইতিহাস ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নদওয়াতুল উলামার আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তাহলে এ থেকে বড় জুলুমের কথা তাঁর শানে আর কিছু হবে না। বরং সত্য কথা হলো এই যে, তাঁরা উভয়ে নিজের নিজের যুগের ফিতনার মুকাবিলা করেন এবং একজন এখানে দূর্গ নির্মাণ করেন, আর অপরজন ওখানে। উভয়ে নিজ নিজ যুগের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন এবং পরিবর্তনশীল যুগের চাহিদা অনুযায়ী দ্বীনের রক্ষক ও হকের দাঈ এবং শরীআতের মুখপাত্র প্রস্তুত করার প্রচেষ্টা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের উভয়কে সুউচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং তাঁদের সহকর্মী ও বিরোধিতাকারীদেরকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন এবং আমাদেরকে তাদের সহীহ মাকসাদ বুঝার ও তাঁদের নকশে কদমে চলার তৌফিক দান করুন।

ইসলাহ ও তাজদীদের ইতিহাসে ব্যক্তির মর্যাদা ও কাজ

প্রিয় তালেবে ইলম! ইসলামী তাজদীদ ও ইসলাহের পূর্ণ ইতিহাসই হলো ব্যক্তির পাহাড়সম দৃঢ়তার ইতিহাস। বলার জন্য তো বলা হয় যে, তা জাতি ও মিল্লাতী ইতিহাস এবং নিঃসন্দেহে তা এরূপ। কিন্তু বাস্তবে তা শুরু হতে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তির যোগ্যতা, তাদের দৃঢ় সংকল্প ও হিম্মতের বহিঃপ্রকাশ। কারণ যখনই ইসলাম হায়াত ও মওতের সন্ধিক্ষণে এসে পতিত হয়, যখন কোন এক দিক থেকে ইসলামকে আক্রমণ করা হয় তখনই কোন একজন মরদে কামিল পাহাড়সম সংকল্পের অধিকারী ব্যক্তি সামনে অগ্রসর হন। এমন নাজুক মুহূর্তে

কোন কাউন্সিল বা পরামর্শ অনুষ্ঠিত হয় না। কোন একজন সাহেবে ইকীন সামনে আসেন এবং হালতের ধারাকে পালটে দেন। হযরত উমর ইবন আব্দুল আযীয (রহ.) ও হযরত হাসানুল বসরী (রহ.) থেকে শুরু করে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রহ.)-এর খান্দান এবং এ সকল দ্বীনী মারকাযের প্রতিষ্ঠাতা, বর্তমান দ্বীনী দাওয়াত ও প্রচেষ্টার পতাকাবাহীগণ সকলে একই সুতায় গাঁথা।

کار زلف تست مشک افشانی اما عاشقاں
مصلحت را تہمتے بر آہوے چیں بستہ اند

মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) ও শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রহ.)-এর অবদান

আল্লামা ইকবাল (রহ.) হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) সম্পর্কে বলেন :

وہ ہند میں سرمایۂ ملت کا نگہباں
اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار

"তিনি ছিলেন ভারতীয় মুসলমানদের নেগাহবান
আল্লাহ তাকে সময় মত করেন হুঁশিয়ার।"

তাঁর প্রচেষ্টার কারণে ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্ক দ্বীনে হিজাযী ও মুহাম্মদে আরবী (সা.) থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি এবং হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ব্রাহ্মণ্য আক্বীদা-বিশ্বাসের ছত্রছায়ায় চলে যাবার পরিবর্তে ইসলামী ও শরীআতে মুহাম্মদীর সুশীতল ছায়াতলে এবং তার আমানতে থাকা পছন্দ করেছে। সম্রাট আকবরের রাজ-সিংহাসনে মহিউদ্দীন আলমগীরের মত একজন ইসলামী চেতনার অধিকারী ও ফকীহ বাদশাহ উপবিষ্ট হবার ক্ষেত্রে তাঁর গোপন হাত ছিল। এর পরে এ দেশে তাজদীদ ও দ্বীনী জাগরণের যে সকল কাজ হয়েছে, তা শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রহ.) ও তাঁর খান্দানের অবদান। দারুল উলূম দেওবন্দের কথা বলুন আর সাহারানপুরের কথা বলুন, অথবা লাক্ষ্ণৌর কথা বলুন, আমরা সকলেই তাঁদের দস্তরখান হতে নিয়ামত গ্রহণ করছি। দারুল উলূম দেওবন্দ, মাজাহির উলূম সাহারানপুর ও দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা এবং কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা দানের সকল মারকায ঐ এক চেরাগ হতেই আলোকিত হয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের সনদের সিলসিলা হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রহ.) ও তাঁর সম্মানিত পরিবার এবং বিজ্ঞ ছাত্রদের পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে।

یک چراغیست دریں خانہ کہ از پرتو آں
ہر کجا می نگری انجمنے ساختہ اند

"একটিমাত্র প্রদীপ ছিল এ ঘরে, তার স্নিগ্ধ আলো যেখানে গিয়েছে,
সেখানেই গড়ে উঠেছে নূরের মাহফিল।"

দারুল উলূম দেওবন্দের ছাত্রদের যিম্মাদারী

আপনি যে মাদরাসায় তালিম গ্রহণ করছেন আপনার উপর এ মাদরাসার দাবি রয়েছে। আর তা হলো এই যে, আপনি যুগের এ চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করুন। এখানে যদি কেউ আসে, তো এখানে কোন ধরনের উচ্ছ্বাস তার নজরে পড়বে না। কিন্তু এর গভীরে এক জলোচ্ছাস ঘূর্ণায়িত হচ্ছে। এখনো যদি কোন একটি ঊর্মিমালা জলোচ্ছাসের আকারে উঠে আসে এবং ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিকদের মসনদ প্রকম্পিত করতে পারে, তাহলে তা এ সুমদ্র থেকেই উঠবে।

اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی
نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہہ و بالا

"এ সুমদ্র হতেই উঠে জলোচ্ছ্বাসের ঊর্মিমালা
যাতে তছনছ হয়ে যায় বাতিলের সিংহাসন॥"

অত্যন্ত নাজুক মুহূর্ত

আমি ইতিহাসের একজন ছাত্র। ইতিহাস আমার অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। আমি ভারতের ইতিহাস যতটুকু অধ্যয়ন করেছি, তার আলোতে বলতে পারি যে, ভারতের হাজার বছরের ইতিহাসে এমন নাজুক সময় ইতিপূর্বে আর কখনো আসেনি। কারণ এ যুগে অবস্থার পরিবর্তন সাধনে, দিল ও দেমাগকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে, মানুষের সদিচ্ছাসমূহকে ধ্বংস করতে, জযবাসমূহ খতম করতে, ক্ষমতার পট পরিবর্তন করতে, দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তার পদ্ধতিতে বিপ্লব সাধন করার ক্ষেত্রে এত অসংখ্য উপকরণের আয়োজন হয়েছে, যা ইতিপূর্বে আর কখনো ছিল না। পূর্বে যে সকল যুগ অতিবাহিত হয়েছে, সে সময় কী এ ধরনের উপকরণ ছিল? তখন কী রাজনীতির এ মিষ্টি ও চটকদার কথা ছিল? গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের এ স্লোগান ছিল কী? পত্রিকা, মিডিয়া, প্রেস, রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য গণমাধ্যমের এরূপ শক্তি ছিল কী? এ ধরনের বিশাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছিল কী? এ ধরনের মিটিং সিটিং, সমাবেশ ও প্রোপাগান্ডার দক্ষতা ছিল কী?

যুগের আবুল ফয়েজ ও ফয়জী

বিগত যুগের সর্ব বৃহৎ ফিতনা ছিল আকবরের দ্বীনে ইলাহীর ফিতনা। তার পরেও কী ঐ সময়ের সরকার প্রধানের নিকট এ ধরনের বৃহৎ শিক্ষা কেন্দ্র ছিল ? এ ধরনের লক্ষ লক্ষ কপি পত্রিকা প্রকাশিত হত কী? এ ধরনের নিত্য নতুন আবিস্কার ছিল কী? মুহূর্তের মধ্যে পশ্চিমের খবর পূর্বে পৌছে দিবার মত গণমাধ্যম ছিল কী? নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, আকবরের নিকট আবুল ফয়েজ ও ফয়জীর মত দক্ষ ও বিজ্ঞ লোক ছিল। আমি আবুল ফজল ও ফয়জীর বিচক্ষণতা ও তীক্ষ্ণ মেধার কথা শুধু যে স্বীকার করি তা নয়; বরং তার কারণে আমি প্রভাবিত। কিন্তু আজকে তো অসংখ্য আবুল ফজল ও ফয়জী রয়েছে। তারা সে সময় মাত্র ছিল দু'জন। কিন্তু আজকে তাদের কার্য সম্পাদন করার জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আবুল ফয়েজ ও ফয়জীর মাঝে কখনো কখনো দ্বীনী জযবা জাগ্রত হতো। আর এ কারণে ফয়জীর কলম থেকে 'সাওয়াতুল ইলহাম'-এর মত বিস্ময়কর তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু আজকের আবুল ফজল ও ফয়জীর মাঝে এতটুকু আল্লাহভীতিও নেই যা তাদের যুগের লোকদের মাঝে ছিল। সে সময়ের আধুনিকতাপ্রিয় ও প্রগতিশীল লোকদের মাঝে ইসলামের ব্যাপরে যে জযবাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, তা এ যুগের মানুষের মাঝে নেই।

ধর্মহীনতা ও সংশয়ের নতুন দরজা

প্রিয় তালেবে ইলম! দর্শন ও ইলমে কালাম আজকে তার অনেক শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সায়েন্সের বিষয়ে আজ লেখাপড়া করিয়ে ধর্মহীন করা, সন্দেহ সৃষ্টি করা ও নাস্তিক করার ঐ শক্তি নেই, যে শক্তি ঊনবিংশ শতাব্দির শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ছিল। বর্তমানে তার এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই, বরং তার কাছে এখন তার পতাকাবাহীদের অবস্থার পরিবর্তনের কারণে দ্বীনের অসংখ্য বিষয় বুঝার ক্ষেত্রে এবং আল্লাহ্ ও আলিমুল গায়বের অস্তিত্ব সম্পর্কে অসংখ্য নতুন নতুন দলীল-প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। তাই বলা যায় যে, বর্তমান যুগের দর্শন ও সায়েন্সের মাধ্যমে ঐ ধরনের নাস্তিকতা, ধর্মহীনতা ও ধর্মের ক্ষেত্রে সংশয় সৃষ্টি করা সম্ভব নয় যা ঊনবিংশ শতাব্দীর উলামায়ে হককে অস্থির ও পেরেশান করে রেখেছিল। বর্তমানে তার স্থানে রাজনীতি ও অর্থনীতি এবং সাহিত্য ও ইতিহাসের মাধ্যমে নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার কাজ নেয়া হচ্ছে। সমাজ বিজ্ঞান ও ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে ধর্ম বিদ্বেষী ও মানসিকভাবে অস্থিরতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। আপনার কাছে নিশ্চয়ই বিস্ময়কর ঘটনা মনে হবে যে,

অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও উর্দূ বিভাগ নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে এবং কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ দ্বীনী বিষয়ে সর্বাধিক দূর্বল।

বাস্তবসম্মত পর্যলোচনা ও ব্যাপক প্রস্তুতি

আমাদেরকে এ সকল বিষয়ে গভীর দৃষ্টি, প্রশস্ত হৃদয় এবং বাস্তব-প্রিয়তার সাথে পর্যলোচনা করতে হবে এবং দেখতে হবে যে, আমাদের জীবনের কর্মক্ষেত্রে নামার পূর্বে এবং ইসলামী দাওয়াত ও ইসলামী শরীআতের হিফাযতের পবিত্র যিম্মাদারী নিজেদের স্কন্ধে নেবার পূর্বে কোন ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত এবং কোন ধরনের আধুনিক উপকরণ গ্রহণ করা ও আধুনিক রণকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা ও তাতে দক্ষতা অর্জন করা জরুরী।

আপনাদের জন্য তাকদীরে ইলাহী এ যুগকে নির্বাচন করেছে। তাই সর্ব প্রথম আপনাকে জানতে হবে যে, আপনাকে কোন যুগের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি চিন্তার যেমন বিষয়, তেমনি খুশিরও বিষয়। সহানুভূতি পাবারও বিষয় এবং মুবারকবাদী পাবারও বিষয়। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এর যোগ্য মনে করেছেন এবং এক মহৎ খিদমত আপনার যিম্মায় প্রদান করেছেন। আপনি এ যিম্মাদারীকে কবূল করুন, সময়ের এ ফিতনা ও যামানার নিষ্ঠুরতাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন এবং আল্লাহ্র কাছে তাওফীক লাভের জন্য দু'আ করুন। কারণ, আপনার পূর্বপুরুষগণ স্বীয় যুগের বিদ'আত ও বিগাড় এবং যামানার ফিতনা ও গোমরাহীকে যেমন গ্রহণ করেননি, ঠিক তেমনি আপনি যেন এ যুগের বিদ'আত ও বিগাড় এ যামানার ফিতনা ও গোমরাহী এবং জাহিলিয়তকে গ্রহণ না করেন।

ধর্মের পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি ও তার ফিতনা

আপনি ঐ চ্যালেঞ্জকে কবূল করুন যা ধর্মকে সব ধরনের প্রভাব ও রাহনুমায়ী করা হতে এবং জীবনে তার প্রভাব বিস্তার করা হতে বিরত রাখে। ধর্মবিমুখ ইউরোপ এ ধ্যান-ধারণা পোষণ করে যে, ধর্ম একটি ব্যক্তিগত বিষয় এবং তা সব ধরনের স্বাধীন শিক্ষানীতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী। যদি এ দৃষ্টিভঙ্গি এখানে বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে ভারতে ঐ অবস্থায় সৃষ্টি হবে যার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন পঞ্চাশ বছর পূর্বে আল্লামা ইকবাল :

ملا کو جو ہے ہند میں سجدہ کی اجازت
نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے ازاد

"মোল্লাকে যতটুকু দেয়া হয়েছে ভারতে সিজদার অনুমতি
নাদান তাতেই মনে করে যে, ইসলাম এখানে স্বাধীন।"

দেওবন্দের আলিমগণ অত্যন্ত সফল ও প্রভাব সৃষ্টিকারী হতে পারেন

যদি শুধুমাত্র দারুল উলূম দেওবন্দের আলিমগণ দৃঢ় সংকল্প করেন এবং আল্লাহ্‌র তাওফীক তাদের সাথে থাকে, তাহলে এ অবস্থার পরিবর্তন সাধনে তাঁরা যথেষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারেন। কারণ, সাধারণ জনগণের সাথে তাঁদের যে ধরনের সুসম্পর্ক রয়েছে তা অন্য কোন ধর্মীয় জামাতের সাথে নেই। তারা সারা ভারতে দ্বীনী মাদরাসা বা আরবী মাদরাসার জাল বিছিয়ে দিয়েছেন। ঐ সকল মাদরাসায় তাঁরা শিক্ষকতা করেন, সাধারণ মুসলমানদের কাছে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে এবং মসজিদ ও মাহফিলে তাঁদের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু এর জন্য কালান্দরের মত ইশক ও ইয়াকীনের প্রয়োজন যা দেখে বাস্তবতা উপলব্ধিকারী কবি চিৎকার দিয়ে বলে উঠে :

ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے
وہ مرد درویش جس کو حق نے دئے ہیں انداز خسروانہ

"ক্ষণে ক্ষণে যদিও আসে ঝড়ের ঝাপটা, তবু মর্দে মুমিন জ্বালান দ্বীনের বাতি
আল্লাহ যাকে দিয়েছেন হিম্মত বুলন্দ, কলবে আছে যার ঈমানের দ্যুতি।"

মানসিক প্রস্তুতি ও ব্যক্তিত্ব গঠন

এ সকল নিত্য নতুন ফিতনা মুকাবিলা করার জন্য আপনাকে মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এবং ইলমী, আখলাকী ও রূহানীভাবেও নিজকে গঠন করতে হবে। একদিকে আপনাকে আধুনিক ফিতনা, চিন্তা ও দর্শনের বাস্তবতা ও গভীরতা, তার প্রেক্ষাপট, কারণ ও উপকরণ এবং তার অগ্রগতির ইতিহাসকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। যাতে নিজের প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বি সম্পর্কে পুরাপুরি অবহিত হওয়া যায়, তার শক্তি ও কৌশল, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। কারণ, মুকাবিলার জন্য এ সকল বিষয় প্রথম শর্ত। অন্যদিকে যথেষ্ট পরিমাণ অভ্যন্তরীণ পরিপক্কতা ও অবিচলতা, প্রচুর পরিমাণে আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মপরিচয় ভাব সৃষ্টি করতে হবে। যাতে কেউ যেন

আপনার বিবেককে, আপনার আক্বীদাকে, আপনার দ্বীনী চেতনাকে সওদা করার স্বপ্নও না দেখতে পারে। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি তার শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে এক মুঠো খাবারের বিনিময়ে বিক্রি হওয়া এবং নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞানকে নিলামে বিক্রি করা শেখায়। কিন্তু আমাদের শিক্ষা নীতি এ কথায় বিশ্বাসী যে :

ہر دو عالم قیمت خود گفتئی
نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز

"আমার মূল্য যদি মনে করো দু'জাহান
তাহলে তুমি আমাকে বড়ই সস্তা মনে করেছ।"

বিবেকের সওদাবাজীর যুগ

বর্তমান যুগ হলো বিবেক-বুদ্ধি, দ্বীন ও ঈমানের সওদাবাজীর যুগ। বর্তমানে এমন অসংখ্য পন্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি এবং বিজ্ঞ লেখক রয়েছেন যাদের মেধা ও জ্ঞান-গবেষণার সামনে আমাদের কোন তুলনা নেই। কিন্তু বিবেক নামের কোন বস্তুর ঠাঁই তাদের কাছে নেই। তাদের দেমাগের স্থানে দেমাগ রয়েছে এবং তাদের দিলের স্থানেও দেমাগ রয়েছে। বরং তাদের বুকের ভিতর স্পন্দনকারী হৃদয়ের পরিবর্তে একটি চলমান ও গতিশীল কলম রাখা হয়েছে। যা সকল বস্তু লিখতে সক্ষম। তাদের নিকট আখিরাতে জবাবদিহিতা, বিবেকের দংশন ও অনুশোচনা বলতে কোনকিছু নেই। তাদের যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলা ও তার দাবিসমুহের প্রচার প্রসার করার সীমাহীন যোগ্যতা রয়েছে।

নতুন নেতৃত্বের প্রয়োজন

আপনি এখান থেকে শিক্ষক হয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করুন, তাতেও মুবারকবাদ, আপনি কোন পাঠ্য পুস্তকের শরাহ লেখেন, তাতেও মুবারকবাদ, আপনি যদি খতীব ও বক্তা হোন, তাতেও মুবারকবাদ, আপনি যদি লেখক হোন, তাতেও মুবারকবাদ, আমি নিজেও এ ধরনের কাজের অপরাধী। কিন্তু বর্তমান যুগে এ থেকেও অধিক অন্য কাজের জরুরত। বর্তমানে এমন মর্দে মুমিনের প্রয়োজন, যিনি এ আধুনিক যুগকে একটি নতুন চিন্তার নেতৃত্ব, একটি নতুন ধর্মীয় আত্মবিশ্বাস এবং নতুন রূহানী ও আখলাকী শক্তি উপহার দিতে সক্ষম। এমন যদি না হয়, তাহলে তা হবে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য বিরাট বিপদের কথা এবং সেই সাথে তা হবে এ দেশের জন্য একটি ভয়াবহ ট্রাজেডী। বর্তমানে

আমাদের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরতে শুরু হয়েছে এবং ঐ অবস্থা সৃষ্টি হতে চলেছে যা পবিত্র কুরআন মুজেযাময় ভাষায় উল্লেখ করেছে :

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا۔

"তারা কী দেখছে না যে, আমি ওদের দেশকে তার আশপাশ হতে সংকুচিত করে চলেছি?" [সূরা রাদ : ৪১]

এবং অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :

إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ

"যমীন তার প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাদের উপর সংকীর্ণ হয়েছিল এবং তাদের জন্য তাদের প্রাণও সংকুচিত হয়ে ছিল।" [সূরা তাওবা : ১১৮]

আজকে আমরা যে দেশে বসবাস করছি এবং যে দেশে দ্বীন ও ইলমের দূর্গ নির্মাণ করছি তা পাথরের টিলা বা শক্ত ময়দান নয়, বরং তা বালুময় প্রান্তর, যার বালুকণাকে প্রতিটি মুহূর্ত ঘুর্ণিঝড় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং তা আমাদের নিচ থেকে সরে যাচ্ছে। এটি এমন এক যমীন যাকে পবিত্র কুরআন كثيبا مهيلا."বহমান বালুকাস্তুপ" বলে আখ্যায়িত করেছে।

বাস্তবতাবোধ ও আত্ম পরিচয়

প্রিয় তালেবে ইলম! যামানা আপনাকে শিক্ষা দেবার পূর্বে, যামানার নিষ্ঠুরতা ও নির্মম বাস্তবতা আপনার চক্ষু খুলে দেবার পূর্বে আপনি নিজেই চক্ষু খোলার ও আলো হাসিল করার চেষ্টা করুন। আশপাশের জগতকে পর্যবেক্ষণ করুন এবং দেখুন যে, হঠাৎ সৃষ্টি হওয়া ইনকিলাব আপনাকে কোথায় নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছে। কোথায় মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী (রহ.), মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গিরী (রহ.) ও মাওলানা শিবলী নুমানী (রহ.)-এর যুগ আর কোথায় আজকের যুগ! সুতরাং আপনি দৃঢ়তার সাথে এ ধারণা নিয়ে নিজের মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং আসাতেযায়ে কিরাম আপনাকে রাহনুমায়ী করবেন, যাতে আপনি যখন এ ক্ষুদ্র পরিসর হতে বের হয়ে বিশাল বিস্তৃত জগতে বসবাসের জন্য অবস্থান করবেন, তখন যেন আপনি বাস্তবতার সাথে চোখ মিলাতে পারেন এবং প্রতিকূল পরিবেশের সাথে পাঞ্জা লড়তে সক্ষম হন।

আপনাদের এ জামাতের ভিতর এবং এ ধরনের ছিঁড়াফাটা কাপড় ও জীর্ণ-শীর্ণ শরীরের মাঝে একটি জীবন্ত সিংহ ঘুমিয়ে রয়েছে। আপনারই মাঝে একটি পবিত্র আত্মা দাঈ ও একজন মুখলিস নিবেদিত প্রাণ সমাজ সংস্কারক বিদ্যমান

রয়েছে, যার ব্যাপারে আপনি নিজেই বেখবর এবং আপনার সম্মানিত উস্তাদগণ ও আপনার বন্ধু-বান্ধবগণও বেখবর রয়েছেন। আমি আমার দূর্বল ও ক্ষীণ আওয়াজ দ্বারা ঐ সকল ঘুমন্ত যোগ্যতাকে জাগ্রত করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। হায়! যদি আমার এ আওয়াজ দরওয়াজার ভিতর প্রবেশ করত এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিদের মাঝে চেতনা সৃষ্টি হতো! আর আপনিও আপনার ঘুমন্ত প্রতিভা সম্পর্কে অবহিত হতে পারতেন! আল্লামা ইকবাল নতুন চাঁদকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, আর আমি আপনাদেরকে সম্মোধন করে বলছি :

بر خود نظر کشاز تہی دامنی مرنج

در سینۂ تو ماہ تمامی نہادہ اند

"নিজের শূন্য আঁচলের দিকে তাকিয়ে তুমি ব্যথিত হয়ো না
তোমার সীনায় তো লুকিয়ে আছে– পূর্ণিমার উজ্জ্বল চাঁদ।"